বাংলা জাতীয় মাসিক

পরওয়ানা

www.parwana.net

ডিসেম্বর ◆ ২০২৪



বাংলা জাতীয় মাসিক

পরওয়ানা

৩১তম বর্ষ ■ ১২তম সংখ্যা

ডিসেম্বর ২০২৪ ♦ অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৪৩১ ♦ জমা.আউয়াল-জমা.সানী ১৪৪৬

পৃষ্ঠপোষক
মুহাম্মদ হুছামুদ্দীন চৌধুরী

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি
আহমদ হাসান চৌধুরী

সম্পাদক
রেদওয়ান আহমদ চৌধুরী

নিয়মিত লেখক
আবু নছর মোহাম্মদ কুতুবুজ্জামান
রহমান মুখলেস
মোহাম্মদ নজমুল হুদা খান
মারজান আহমদ চৌধুরী

বিভাগীয় সম্পাদক
মুহাম্মাদ উসমান গণি

সহ-সম্পাদক
মনজুরুল করিম মহসিন
মো. মাহমুদুল হাসান

বিজ্ঞাপন ও বিপণন ব্যবস্থাপক
এস এম মনোয়ার হোসেন

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
আহসান মাহমুদ

যোগাযোগ
সম্পাদক, মাসিক পরওয়ানা
ফুলতলী কমপ্লেক্স ঢাকা
খিলগাঁও, ঢাকা-১২১৯
মোবাইল: ০১৭৯৩ ৮৭৭৭৮৮

সিলেট অফিস
পরওয়ানা ভবন
৭৪ শাহজালাল লতিফিয়া আ/এ
সোবহানীঘাট, সিলেট-৩১০০
মোবাইল: ০১৭৯৯ ৬২৯০৯০

parwanabd@gmail.com
www.parwana.net

মূল্য: ৩৫ টাকা

সূচিপত্র

তাফসীরুল কুরআন
আত-তানভীর/আল্লামা আব্দুল লতিফ চৌধুরী ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ্ (র.)
অনুবাদ: মুহাম্মদ হুছামুদ্দীন চৌধুরী ০৩

শারহুল হাদীস
দুনিয়াতে তুমি এমন হও যেন অপরিচিত-ভিনদেশি কিংবা মুসাফির/মোহাম্মদ নজমুল হুদা খান ০৫

সাহাবা
হযরত উসমান ইবন আফফান (রা.) এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও কারামত/মাওলানা মো. ছালিক আহমদ (র.) ০৭

প্রবন্ধ
আত্মপ্রদর্শন নয় বিনয়ই তাসাওউফের মূলকথা/মুফতি গিয়াস উদ্দিন চৌধুরী ০৯
বাংলাদেশে ইসলামবিদ্বেষ : কারণ ও করণীয়/মারজান আহমদ চৌধুরী ১২
সাহাবীদের মর্যাদা : শরীআত ও ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিত অধ্যয়ন/মুহাম্মাদ সায়ীদ ১৪

ফিকহ
উযূর মাসাইল/মো. মুহিবুর রহমান ১৯

প্যারেন্টিং
শিশুর বেড়ে ওঠার সময় : লালন-পালন ও তারবিয়াত/মূল: হুজ্জাতুল ইসলাম আবূ হামিদ আল গাযালী (র.)
অনুবাদ: ইমাদ উদ্দীন তালুকদার ২২

আন্তর্জাতিক
ট্রাম্পের বিজয় ও চতুর্ধা বিভক্ত মুসলিম ভোটার/মুহাম্মাদ বিন নূর ২৮

নিয়মিত
এই মাসে এই চাঁদে ৩০
জীবন জিজ্ঞাসা ৩১
খাতুন ৩৪
বিজ্ঞান ৩৫
এক নজরে গতমাস ৩৬
কবিতা ৩৮
আবাবীল ফৌজ ৩৯
সম্পাদকীয় ০২

সম্পাদক কর্তৃক বি.এন টাওয়ার (৯ম তলা), ২৮/১ বি, দৈনিক বাংলা মোড়, মতিঝিল ঢাকা-১০০০ হতে প্রকাশিত এবং সানজানা প্রিন্টার্স, ৮১/১, নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০ হতে মুদ্রিত।

সম্পাদকীয়

نحمده ونصلی علی رسوله الکریم– اما بعد

গত মাসের ২৫ তারিখে বাংলাদেশ সম্মিলিত সনাতনী জাগরণ জোট (ইসকন)-এর মুখপাত্র চিন্ময় কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারীকে রাষ্ট্রদ্রোহের মামলায় শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে আটক করা হয়। পরদিন আদালত তাঁর জামিন মঞ্জুর না করে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দিলে চিন্ময়ের (ইসকন) উগ্র সমর্থকরা আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর উপর সহিংস হামলা করে এবং আদালত চত্বরেই রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী অ্যাডভোকেট সাইফুল ইসলাম আলিফকে প্রকাশ্যে কুপিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়।

গত ২৫ অক্টোবর চট্টগ্রামের এক সমাবেশে চিন্ময় দাস ছাত্রজনতার উড়ানো জাতীয় পতাকার উপরে গেরুয়া পতাকা (উগ্র হিন্দুত্ববাদের নিশানা) উড়িয়ে জাতীয় পতাকাকে অবমাননা করেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এর দায়ে তাঁর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা করা হলে চিন্ময় দাসকে গ্রেফতার করা হয়; হিন্দু নেতা বা হিন্দু ধর্মাবলম্বী বলে আটক করা হয়নি। কিন্তু ইসকন ও হিন্দুত্ববাদের প্রোপাগান্ডা-সেল উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এই গ্রেফতারকে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় ধর্মীয় নেতার আটক হিসেবে দেখিয়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগানোর অপচেষ্টা করে। এধরনের ষড়যন্ত্র ও প্রোপাগান্ডা নতুন কিছু নয়, জুলাই অভ্যুত্থান-পরবর্তী সময়সহ এর আগেও বহুবার এমন ষড়যন্ত্রমূলক দাঙ্গা লাগানোর অপচেষ্টা হয়েছিল।

বর্তমানে দেশে যে সমস্ত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধানোর অপচেষ্টা চলছে, সেগুলোর নেপথ্যে এই চিন্ময় দাস ও ইসকনের প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ মদদ ও উস্কানি রয়েছে বলে গোয়েন্দা তথ্যে উঠে এসেছে। অথচ বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক অনন্য উদাহরণ। এদেশে হিন্দু-মুসলিমসহ সকল ধর্মের মানুষেরা শতসহস্র বছর ধরে শান্তিপূর্ণভাবে সহাবস্থান করে আসছে। অতীতে অনেকবারই ইসকনসহ দেশবিরোধী অপশক্তি ষড়যন্ত্র ও উস্কানির অংশ হিসেবে যখন নিজেরাই (কিছু বিপথগামী সনাতনী) মন্দিরে ভাঙচুর করে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নস্যাৎ ও দেশকে অস্থিতিশীল করতে চেয়েছিল, তখনও এদেশের শান্তিপ্রিয় জনগণ (মুসলিমরা) রাত জেগে মন্দির পাহারা দিয়ে ধর্মীয় সম্প্রীতি বজায় রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করে। তাছাড়া ঐতিহাসিকভাবেই দেশের যে-কোনো দুর্যোগ-বিপর্যয়ে এদেশের হিন্দু-মুসলিমরা একে অপরের পাশে দাঁড়ায়। এমনকি সাম্প্রতিক দুর্যোগকালেও দেখা গেছে, অনেক মুসলিম দাতব্য সংস্থা ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সাধারণভাবে সকল মানুষকে সহযোগিতা করার পাশাপাশি বিশেষভাবে হিন্দু ও অন্য ধর্মাবলম্বীদের সহযোগিতা করেছে।

অন্যদিকে উগ্র হিন্দুত্ববাদের ধারক ইসকন বহুদিন ধরে বাংলাদেশে নানান সন্ত্রাসী ও ষড়যন্ত্রমূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে এদেশে ধর্মীয় সম্প্রীতি বিনষ্টসহ উগ্রতা ও চরম বিতর্ক ছড়িয়ে দিচ্ছে। তাদের সন্ত্রাসী ও উগ্র কর্মকাণ্ডের মধ্যে রয়েছে- স্বামীবাগে মুসলিমদের তারাবী নামাযে বাধা দেওয়া ও সংঘর্ষ বাঁধানো (২০১৪, ঢাকা); ইসকনের বিরুদ্ধে স্ট্যাটাস দেওয়ায় এক ইমামকে হত্যা করা (২০১৬, সিলেট); রশিক রায় জিউ মন্দিরে ইসকনভক্তদের হামলায় একজনের নিহত হওয়া (২০০৯, ঠাঁকুরগাঁও); ইসকন মন্দিরে আগ্নেয়াস্ত্র রাখা এবং মুসল্লীদের উপর নৃশংস হামলা করা (২০১৬, সিলেট); মুসলিম শিশুদের হিন্দু দেবতার নামে প্রসাদ খাওয়ানো (২০১৯, চট্টগ্রাম); ভোলায় মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের জায়গা জোরপূর্বক দখলের চেষ্টা (২০১৯, ভোলা); ইসকনের অন্তর্দ্বন্দ্বীয় কলহের জেরে নিজেরা মন্দিরে হামলা-প্রতিহামলা করে মুসলিমদের নামে ইন্টারনেটে প্রচার করা (২০২০, নেত্রকোণা); প্রবর্তক সংঘে ইসকনের নৃশংস হামলায় ১২ জনের আহত হওয়া ও চুক্তিভঙ্গ করা (২০২১, চট্টগ্রাম)-সহ সম্প্রতি চট্টগ্রামে জাতীয় পতাকাকে অবমাননা করে রাষ্ট্রের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বকে অস্বীকার করা; আদালত চত্বরেই রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীকে নির্মমভাবে হত্যা করা ইত্যাদি।

১৯৬৬ সালে অভয় চরণাবিন্দ নামক এক হিন্দু যাজক কর্তৃক মার্কিন মুল্লুকে প্রতিষ্ঠিত ইসকন (International Society for Krishna Consciosness) শুরু থেকেই নানান উগ্র, উস্কানীমূলক ও চরম বিতর্কিত কর্মকাণ্ড করে আসছে। ইসকনকে এজন্য দেশে-বিদেশে বহু মামলা-মোকদ্দমার মুখোমুখি হয়ে বহুবার শাস্তি পেতে হয়েছে। এমনকি তাদের এসব সন্ত্রাসী, উগ্র ও ষড়যন্ত্রমূলক কর্মকাণ্ডের জন্য চীন, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়াসহ মধ্য-এশিয়ার অনেক দেশেই ইসকন নিষিদ্ধ বা আংশিক নিষিদ্ধও হয়েছে।

সম্প্রতি বাংলাদেশেও তারা বিভিন্ন সন্ত্রাসী ও ষড়যন্ত্রমূলক কর্মকাণ্ড করে এদেশের সার্বভৌমত্ব ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিকে প্রশ্নবিদ্ধ করছে এবং অভ্যুত্থান-পরবর্তী পরিস্থিতি ও স্থিতিশীলতাকে বিনষ্ট করে ফ্যাসিবাদকে পুনর্বাসন আর এসব উদ্দেশ্যপ্রণোদিত দাঙ্গা-হামলার সুবিধা ভারতের উগ্র রামভক্ত বিজেপিকে দিতে চায় বলে সর্বমহলে আলোচিত হচ্ছে। অনেক বিশেষজ্ঞের মতে, কট্টর সাম্প্রদায়িক-সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ও উগ্র হিন্দুত্ববাদের সমর্থক ভারতের বিজেপি ইসকনকে সবরকম সহযোগিতা, ক্ষমতা ও লজিস্টিক সাপোর্ট দিয়ে এদেশে অস্থিরতা, নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির মধ্যদিয়ে বাংলাদেশের উপর একক প্রভুত্ব কায়েম করতে চায়। আর এই ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবেই সম্প্রতি ইসকন চট্টগ্রামে জাতীয় পতাকাকে অবমাননা করে দেশের স্বাধীনতা ও অখণ্ডতাকে অস্বীকার, পুলিশ ও অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর উপর হামলা ও এসিড নিক্ষেপ এবং আদালত চত্বরেই প্রকাশ্যে দিবালোকে আইনজীবীকে নির্মমভাবে হত্যা করাসহ স্থানীয় মসজিদে হামলা ও ভাঙচুরের মতো জঘন্য ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ঘটায়। এ-সকল রাষ্ট্রদ্রোহী ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের পরও গ্রেফতারকৃত ইসকন নেতা চিন্ময়ের ভক্ত-সমর্থকরা ভারতীয় সরকারের সাহায্য ও হস্তক্ষেপ কামনা করে, যা বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্বাধীনতা, স্থিতিশীলতা ও সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে হুমকিস্বরূপ, একইসাথে উদ্বেগেরও।

এছাড়া সনাতন ধর্মের মুখোশ পরা ইসকন হিন্দুধর্মেরও প্রতিনিধিত্ব করে না; বরং বিকৃত হিন্দুধর্ম প্রচার করে সনাতন ধর্মের ক্ষতি করছে বলে অনেক হিন্দু ও পুরোহিত মনে করে থাকেন। চট্টগ্রাম প্রবর্তক সংঘের সাধারণ সম্পাদক তিনকড়ি চক্রবর্তীর মতে, ইসকন একটি উগ্রবাদী সংগঠন, যেটি সনাতন ধর্মকে কলঙ্কিত করেছে (২০ মার্চ, ২০২১; ডিবিসি নিউজ)।

সুতরাং, ইসকন ও ইসকনের এসব উগ্র, সন্ত্রাসী ও ষড়যন্ত্রমূলক কার্যক্রম যেহেতু দেশের অখণ্ডতাসহ স্থিতিশীলতা, সার্বভৌমত্ব ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জন্য হুমকিস্বরূপ, কাজেই ইসকনকে বাংলাদেশেও নিষিদ্ধ করা হোক এবং অ্যাডভোকেট সাইফুল হত্যাসহ তাদের সব সন্ত্রাসী ও রাষ্ট্রদ্রোহী কর্মকাণ্ডের দ্রুত বিচার করা হোক।

আত্ তানভীর

আল্লামা আব্দুল লতিফ চৌধুরী
ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.)

অনুবাদ
মুহাম্মদ হুছামুদ্দীন চৌধুরী

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ ۙ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ– إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ ۚ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ– إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ– خَالِدِينَ فِيهَا ۖ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ– وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ– إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ–

অনুবাদঃ যে লোক আমার প্রেরিত দলীলসমূহ এবং হিদায়াতের উপকরণসমূহ গোপন করে আমি প্রকাশ করার পর লোকদের মঙ্গলার্থে কিতাবের মধ্যে, এ ধরনের লোককে আল্লাহ লানত করেন এবং লানতকারী লোকও লানত করে। কিন্তু যারা তাওবাহ করে এবং নিজেদেরকে সংশোধন করে আর সত্যকে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে, এরাই হলো তারা যাদের তাওবাহ আমি কবূল করি। আমি অতিশয় তাওবাহ গ্রহণকারী, পরম দয়ালু। নিশ্চয়ই যারা কুফরী করে এবং কাফিররূপে মারা যায় তাদের উপর লানত। আল্লাহ, ফিরিশতাগণ ও সকল মানুষের, সেখানে তারা স্থায়ী হবে। তাদের শাস্তি লঘু করা হবে না এবং তাদেরকে কোনো অবকাশও দেওয়া হবে না। আর তোমাদের ইলাহ এক ইলাহ। তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। তিনি দয়াময়, পরম দয়ালু। নিশ্চয়ই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে রাত্রি ও দিবসের পরিবর্তনে যা মানুষের হিত সাধন করে তা সহ সমুদ্রে বিচরণশীল নৌযানসমূহে। আল্লাহ আকাশ হতে যে বারিবর্ষণ দ্বারা ধরিত্রীকে তার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন এবং তার মধ্যে যাবতীয় জীবজন্তুর বিস্তরণে বায়ুর দিক পরিবর্তনে আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে নিয়ন্ত্রিত মেঘমালাতে জ্ঞানবান জাতির জন্য নিদর্শন রয়েছে। (সূরা বাকারাহ, আয়াতঃ ১৬০)

তাফসীরঃ

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ ۙ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ

-যে লোক আমার প্রেরিত দলীলসমূহ এবং হিদায়াতের উপকরণসমূহ গোপন করে আমি প্রকাশ করার পর লোকদের মঙ্গলার্থে কিতাবের মধ্যে, এ ধরনের লোককে আল্লাহ লানত করেন এবং লানতকারী লোকও লানত করে।

অর্থাৎ তারা মুহাম্মদ ﷺ-এর বৈশিষ্ট্যসমূহ মানুষদের নিকট হতে গোপন করত। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুসরণ করত না। অথচ তারা তাওরাত এবং ইঞ্জিল কিতাবে হযরত মুহাম্মদ ﷺ, তার আবির্ভাব এবং বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে লিপিবদ্ধ পেত; কিন্তু তা তারা মানুষকে বলতো না।

أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ

-এ ধরনের লোককে আল্লাহ লানত করেন এবং লানতকারী লোকও লানত করে।

হযরত ইবন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি মুআয বিন জাবাল (রা.) ও খারিজা বিন যায়িদ (রা.) ইয়াহুদী আলিমদের এক দলকে জিজ্ঞেস করলেন, তাওরাতের কোনো একটি বিষয় বর্ণনা করার জন্য; কিন্তু তারা তাঁকে এ সম্পর্কে কোনো সংবাদ দিতে অস্বীকার করল এবং তা গোপন করল। তখন আল্লাহ তাআলা এ আয়াত নাযিল করেন।[১]

হযরত মুজাহিদ বলেন, তারা হচ্ছে আহলে কিতাব। হযরত রবী (রা.) এবং কাতাদাহ (রা.)ও এভাবে রিওয়ায়াত করেন।[২] এসব কিছু বলার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে, কেউ ধর্মীয় বিষয়ে কিছু জানলে তা মানুষের কাছে বর্ণনা করা ফরয। যেমন মহানবী ﷺ ইরশাদ করেন, যাকে কোনো বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলো যা সে জানে, এমতাবস্থায় সে যদি তা গোপন রাখে তাহলে কিয়ামতের দিন তাকে আগুনের লাগাম লাগিয়ে দেওয়া হবে।[৩]

اللعن শব্দের আসল অর্থ হচ্ছে দূরে রাখা। অভিশাপকারীদের অভিশাপ অর্থ হচ্ছে তারা আল্লাহর কাছে এদেরকে লানত করার জন্য প্রার্থনা করবে। মানুষ ও সৃষ্টিজগতের জন্য সকল প্রাণীর লানত প্রদান মানে হচ্ছে তারা বলবে হে আল্লাহ! তাকে লানত কর। অথবা আল্লাহর লানত হউক অথবা তার উপর আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হউক।[৪]

হযরত মুজাহিদ (রা.) لاعنون শব্দের অর্থ বলেন, চতুষ্পদ জন্তু। আল্লাহ

তাআলা বনী আদমের গুনাহের কারণে বারি বর্ষণ করেন না। তখন চতুষ্পদ জন্তু বের হয় এবং বলে এটা মানব সন্তানের পাপের ফসল। এই বলে তারা গুনাহগার বান্দাহকে লানত করে।

চতুষ্পদ জন্তু বলতে উট, গরু, ছাগল, এসবকে বোঝানো হয়েছে। তারা নাফরমান বনী আদমকে লানত করে, যখন যমীন শুকিয়ে ফেটে যায়।[৫]

যদিও নির্বোধ প্রাণী বা বস্তুর বহুবচন করতে একবচনের শেষে ي এবং ن যোগ হয় না কিন্তু কোনো কোনো সময় তার ব্যতিক্রম হয়। যার উদাহরণ কুরআন শরীফে রয়েছে। যেমন-وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ আমি চন্দ্র ও সূর্যকে দেখলাম তারা আমাকে সিজদাহ করছে (সূরা ইউসুফ, আয়াত-০৩)। এখানে ساجد একবচন এবং এর সাথে ইয়া এবং নূন যোগ হয়ে বহুবচন হয়েছে। অন্য একদল বলেন,لاعنون শব্দের দ্বারা বুঝানো হয়েছে ফিরিশতা এবং মুমিনীন। হযরত কাতাদাহ (রা.) এবং রবী বিন আনাস (রা.)ও এ অর্থ গ্রহণ করেছেন। অন্য একদল বলেন, আদম এবং জিন ছাড়া সকলেই لاعنون শব্দের ভিতর অন্তর্ভুক্ত। হযরত বারা বিন আযিব (রা.) বলেন, কাফিরকে যখন কবরে রাখা হয়, তখন তার কাছে একটি জন্তু আসে, তার চোখ দুটি ভয়ংকর তার সাথে লোহার লাঠি থাকে এবং তা দিয়ে দু'কাঁধে মারতে থাকে। এ মৃত কাফিরের আওয়াজ যে শুনে সে-ই তাকে লানত করে। তার এ যন্ত্রণাদায়ক আওয়াজ মানুষ আর জিন ছাড়া সকলেই শুনে।[৬]

হযরত ইবন জারীর (রা.) বলেন, لاعنون শব্দের দ্বারা বুঝানো হয় আল্লাহ, ফিরিশতা এবং মুমিনদেরকে। যেহেতু কুরআন শরীফে আছে,

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

-যারা কুফরী করেছে এবং কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে তাদের উপর আল্লাহ, ফিরিশতা ও মুমিনদের লানত। (সূরা বাকারা, আয়াত-১৬১)

এটাই হচ্ছে আসল দলীল এবং অন্যান্য দলীলের চেয়ে এ দলীলকে প্রাধান্য দেওয়া হয়।[৭]

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ ۚ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

-তারা ব্যতীত, যারা তাওবা করে, নিজেদের সংশোধন করে এবং সত্য স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে, তারা সে শ্রেণি, যাদের তাওবা আমি কবুল করি। আর আমি অতিশয় তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু। (সূরা বাকারা, আয়াত: ১৬১)

এ আয়াত দ্বারা বুঝানো হয়েছে আল্লাহ তাআলা এবং লানতকারীরা ঐ সকল লোকদের লানত করেন, যারা হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর নবুওয়াতের বিষয়, তাঁর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য এবং বিশেষণ তাদের কাছে আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে প্রেরিত কিতাব হতে জানার পর তা প্রকাশ না করে বরং গোপন করে রাখে। অর্থাৎ ঐসব লোকের উপর আল্লাহর লানত পড়বে না যারা সত্যকে গোপন করা থেকে তাওবা করে এবং হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর উপর ঈমান আনে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নবুওয়াত স্বীকার করে, এবং বিশ্বাস করে ঐসব কিছু, যা তিনি আল্লাহর পক্ষ হতে পেয়েছেন, প্রকাশ করে ঐসব কিছু, যা তাদের কিতাবসমূহে পেয়েছে যে কিতাব আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন, যা তাদের নবীদের কাছে প্রেরিত হয়েছিল, যাতে নির্দেশ করা হয়েছিল হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর অনুসরণ করার জন্য। তারা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করে ভাল কাজের দ্বারা। এমন কাজ যা দ্বারা আল্লাহ তাআলা সন্তুষ্ট হন। নবীগণের প্রতি অবতীর্ণ আল্লাহ ওহীর মাধ্যমে তারা যা কিছু লাভ করে তা প্রকাশ করে। তাদের কিতাবসমূহে আল্লাহর সাথে তাদের যেসব প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকার উল্লেখ আছে তা তারা গোপন করে না।

এসব লোকেরাই- যাদের বিশেষণ উপরে উল্লেখ করা হয়েছে- আমি তাদের প্রতি রহমতের দৃষ্টি নিক্ষেপ করব। তাদেরকে আমি এমন মানুষের অন্তর্গত করব, যারা আমার আনুগত্যের প্রতি প্রত্যাবর্তন করেছে এবং আমার সন্তুষ্টি অর্জনে ব্রতী হয়েছে। আমি তাওবা কবূলকারী, দয়াবান।[৮]

আবার কেউ কেউ وبينوا শব্দের অর্থ এভাবে লিখেন, وبينوا التوبة باخلاص العمل বিশুদ্ধ ও খালিস আমল দ্বারা তারা তাওবা প্রকাশ করে।[৯]

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

- নিশ্চয়ই যারা কুফর করেছে এবং কাফির অবস্থায়ই মারা গেছে, তাদের প্রতি আল্লাহ, ফিরিশতা এবং সমস্ত মানুষের লানত।

অবশ্যই যে সমস্ত লোকেরা হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর নবুওয়াত অস্বীকার করে এবং ইয়াহুদী নাসারা ও অন্যান্য সব বাতিল ধর্মের অনুসারী মুশরিক, মূর্তিপূজক ইত্যাদি জাতিসমূহের যারাই মহানবী ﷺ এর নবুওয়াতকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে এবং কাফির অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করে তদের উপর আল্লাহ তাআলা, ফিরিশতাগণ ও সমগ্র মানুষের অভিশাপ। এখানে النَّاسِ أَجْمَعِينَ দ্বারা মুমিনদেরকে বুঝানো হয়েছে। হযরত কাতাদাহ (রা.) এবং রবী (রা.)ও একই ধরনের কথা বলেন। হযরত রবী (র.) হযরত আবূ আলীয়া হতে রিওয়ায়েত করেন-ان الكافرين يوقف يوم القيامة فيلعنه ثم تلعنه الملائكة ثم يلعنه الناس اجمعون কাফিরদেরকে কিয়ামতের দিন এক জায়গায় আটকিয়ে রাখা হবে, তখন আল্লাহ তাদেরকে লানত করবেন। তারপর ফিরিশতারা লানত করবে। তারপর সমস্ত লোক তাদেরকে লানত করবে। হযরত সুদ্দী (রা.) হতে বর্ণিত, আল্লাহ তাআলা যালিম ব্যক্তিকে লানত করবেন।

তারপর সমস্ত সৃষ্টি তাকে লানত করবে এবং এটাই হচ্ছে সঠিক বক্তব্য। কারণ শব্দের সাথে স্পষ্টত এ অর্থেরই মিল রয়েছে। হযরত ইবন জারীর (রা.) এ অর্থই গ্রহণ করেছেন।[১০]

خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ

- তারা সে লানতের মধ্যে স্থায়ীভাবে থাকবে। তাদের শাস্তি লাঘব করা হবে না এবং তাদেরকে অবকাশও দেওয়া হবে না।'

যেসকল লোকেরা সত্যকে অস্বীকার করল এবং কুফর অবস্থায় মারা গেল। তার উপর আল্লাহ, ফিরিশতা এবং সমস্ত মানুষের লানত বর্ষিত হয়। সে সর্বদা জাহান্নামে নিমজ্জিত থাকবে। তার থেকে সামান্যতম আযাবও হালকা করা হবে না এবং অপারগতার আবেদন করারও সুযোগ দেওয়া হবে না।[১১]

وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ

-তোমাদের মাবূদ একজনই। তিনি রহমানুর রাহীম। তিনি ছাড়া আর কোনো দ্বিতীয় মাবূদ নেই।

অর্থাৎ তোমরা যতই মূর্তির পূজা কর না কেন, সবই বাতিল এবং ভিত্তিহীন। সমস্ত দলীল ও প্রমাণাদি হতে এ কথাই স্পষ্ট হয়ে উঠে।

১. তাবারী, ৩/২৫০; ২. তাবারী, ৩/২৫০-২৫১; ৩. কুরতুবী, ২/১৭৩; তিরমিযী: ২৬৪৯; ৪. তাবারী, ৩/২৫৪; ৫. তাবারী, ৩/২৫৪-২৫৫; ৬. তাবারী, ৩/২৫৬-২৫৭; ৭. তাবারী, ৩/২৫৭; ৮. তাবারী, ৩/২৫৯; ৯. প্রাগুক্ত, ৩/২৫৯; ১০. তাবারী, ৩/২৬০-২৬৩; ১১. তাবারী, ৩/২৬৪; ১২. তাবারী, ৩/২৬৬-২৭০;



দুনিয়াতে তুমি এমন হও যেন অপরিচিত-ভিনদেশি কিংবা মুসাফির

মোহাম্মদ নজমুল হুদা খান

হাদীসের মূল ভাষ্য

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَخَذَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنْكِبِي وَقَالَ: "كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيْبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ". وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: إِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ.

অনুবাদ: হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার কাঁধ ধরলেন (অর্থাৎ কাঁধে হাত রাখলেন) আর বললেন, তুমি দুনিয়াতে এমন হও যেন তুমি অপরিচিত–ভিনদেশি কিংবা পথ অতিক্রমকারী–মুসাফির।

হযরত ইবন উমর (রা.) বলতেন, যখন তুমি সন্ধ্যায় উপনীত হবে তখন সকালের অপেক্ষা করবে না। আর যখন সকালে উপনীত হবে তখন সন্ধ্যার অপেক্ষা করবে না। তুমি অসুস্থতার পূর্বে সুস্থতাকে এবং মৃত্যুর পূর্বে জীবনকে কাজে লাগাও। (বুখারী, হাদীস-৫৯৪৭)

হাদীসের মূলকথা

দুনিয়ার জীবন ক্ষণস্থায়ী। কোনো মানুষ এখানে স্থায়ী নয়। মৃত্যুর মাধ্যমে সকল মানুষকে অনন্ত জীবনের দিকে পাড়ি জমাতে হয়। তাই কোনো মানুষ, বিশেষত কোনো মুমিন দুনিয়াকে স্থায়ী আবাস মনে করতে পারে না। দুনিয়া সম্পর্কে একজন মুমিনের দৃষ্টিভঙ্গি কেমন হবে উল্লেখিত হাদীসে প্রিয়নবী ﷺ তা অত্যন্ত সুস্পষ্টরূপে তুলে ধরেছেন। হাদীসের মর্মানুযায়ী একজন মুমিন দুনিয়াকে নিজের জন্য ভিনদেশ ভাববে এবং এখানে নিজেকে অপরিচিত ও মুসাফির হিসেবে গণ্য করবে। হাদীসটিতে নবী করীম ﷺ এর পবিত্র মুখনিঃসৃত বাণীর পাশাপাশি হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা.) এর তিনটি উপদেশের কথা উল্লেখিত হয়েছে।

একজন মুমিন দুনিয়াতে ভিনদেশি ও পথিকের মতো থাকবে

হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা.) বলেন,

أَخَذَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنْكِبِي وَقَالَ: "كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيْبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ".

অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার কাঁধ ধরলেন (অর্থাৎ কাঁধে হাত রাখলেন) আর বললেন, তুমি দুনিয়াতে এমন হও যেন তুমি অপরিচিত-ভিনদেশি কিংবা পথ অতিক্রমকারী-মুসাফির।

এখানে হাদীসটিতে একটি বিশেষ অবস্থার বর্ণনা এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইবন উমর (রা.) এর কাঁধে হাত রেখেছেন। কেউ কেউ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মনযোগ আকর্ষণের উদ্দেশ্যে কাঁধে হাত রেখেছেন। আবার কারো মতে, তিনি আন্তরিকতা ও স্নেহবশত কাঁধে হাত রেখেছেন। এদুটি ব্যাখ্যা একই সাথে এভাবে গ্রহণ করা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ অতি আন্তরিকতা ও স্নেহের পাশাপাশি মনযোগ আকর্ষণের উদ্দেশ্যে ইবন উমর (রা.) এর কাঁধে হাত রেখেছেন যেন তিনি উদ্দিষ্ট বিষয়টি ভালোভাবে আয়ত্ত করতে পারেন।

রাসূল ﷺ সস্নেহে যে নসীহতটি করেন তা হলো,

كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيْبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ

-তুমি দুনিয়াতে এমন হও যেন তুমি একজন অপরিচিত-ভিনদেশি কিংবা পথ অতিক্রমকারী -মুসাফির।

গারীব (غَرِيْب) শব্দের অর্থ ভিনদেশি, প্রবাসী, বহিরাগত, অপরিচিত ইত্যাদি। পরিভাষায় গারীব হলো এমন ব্যক্তি, যার আশ্রয়ের মতো কোনো জায়গা নেই, শান্তি খোঁজার মতো কোনো বাসস্থান নেই, থিতু হবার মতো কোনো দেশ নেই। আর আবিরু সাবিল (عَابِرُ سَبِيلٍ) অর্থ পথিক বা মুসাফির; যে সর্বদা সফরের মধ্যে থাকে। শব্দগতভাবে গারীব বা ভিনদেশি'র চেয়ে আবিরু সাবিল বা পথিকের মধ্যে দুনিয়া বিরাগের মাত্রা বেশি। কেননা, ভিনদেশি বা প্রবাসী ব্যক্তি কখনো কখনো অল্পকালের জন্য হলেও কোনো একটি স্থানে আবাস গড়ে কিন্তু

সর্বদা পথ অতিক্রমকারী মুসাফির কোথাও থিতু হয় না। তাই হাদীসের মূল ভাষ্যে أَوْ (কিংবা) শব্দটিকে মুহাদ্দিসীনে কিরাম 'বরং' অর্থে ব্যবহার করেছেন। তখন হাদীসটির অর্থ হবে, তুমি দুনিয়াতে এমন হও যেন শুধু অপরিচিত-ভিনদেশি নও বরং পথ অতিক্রমকারী-মুসাফিরও। এ হিসেবে হযরত ইবন উমর (রা.) এর প্রতি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর উপদেশের সারকথা হলো, একজন ভিনদেশি যেভাবে বিদেশে বসবাস করে, ঐ দেশকে নিজের দেশ মনে করে না, তুমি দুনিয়াকে সেভাবে দেখবে। শুধু তাই নয়, দুনিয়াকে তুমি বিদেশের মতো ক্ষণিক অবস্থানের জায়গাও মনে করবে না বরং তুমি এখানে নিজেকে এমন একজন পথিক মনে করবে, যে কোনো জায়গাকে নিজের অবস্থানের জন্য নির্দিষ্ট করে না।

ইমাম নববী (র.) বলেন, উলামায়ে কিরাম এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেছেন, এর অর্থ হলো, তুমি দুনিয়ার প্রতি ঝুঁকে পড়বে না এবং দুনিয়াকে মূল আবাস হিসেবে গ্রহণ করবে না। তুমি এখানে দীর্ঘকাল থাকার আশা পোষণ করবে না এবং এর প্রতি গুরুত্ব দিবে না। ভিনদেশে একজন প্রবাসীর যেমন সম্পর্ক হয় এখানে তোমার সম্পর্কও তেমন হবে। যে ভিনদেশি নিজ পরিবার-পরিজনের নিকট ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা রাখে সে প্রবাসের বিষয়ে যেমন মশগুল হয় না তুমিও তেমনি দুনিয়ার মধ্যে মশগুল হবে না। (ইমাম নববী (র.), রিয়াদুস সালিহীন, হাদীস নং ৪৭১)

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর এ উপদেশটি হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা.) কে উদ্দেশ্য করে হলেও এর শিক্ষা ব্যাপক। তাই এটি সকল মুসলমানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। হাদীসটিতে দুনিয়াকে স্থায়ী নিবাস হিসেবে গ্রহণ করতে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। প্রকৃত অর্থে দুনিয়া মানুষের জন্য ক্ষণস্থায়ী ভোগের জায়গা মাত্র আর স্থায়ী নিবাস হলো আখিরাত। যেমন পবিত্র কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে,

إِنَّمَا هٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ.

-এ দুনিয়ার জীবন ভোগের বস্তু মাত্র। আর নিশ্চয়ই আখিরাতই হলো স্থায়ী নিবাস। (সূরা গাফির, আয়াত-৩৯)

সন্ধ্যায় উপনীত হলে সকালের আশা করবে না

আলোচিত হাদীসটিতে হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা.) এর তিনটি উপদেশের কথা উল্লেখিত হয়েছে। এর মধ্যে প্রথমটি হলো, হযরত ইবন উমর (রা.) বলতেন, إِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ -যখন তুমি সন্ধ্যায় উপনীত হবে তখন সকালের অপেক্ষা করবে না। এর অর্থ হলো, মানুষের জীবন ক্ষণস্থায়ী। কার মৃত্যু কখন আসে কেউ বলতে পারে না। তাই সন্ধ্যায় উপনীত হলে এ সময় যা করার তা করে নিবে। কোনো আমল বা কাজকে সকালের জন্য ফেলে রাখবে না এবং এরূপ বলবে না যে, আমি এটি সকালে করবো। কারণ, হতে পারে তুমি সকাল পর্যন্ত হায়াত না-ও পেতে পারো।

সকালে উপনীত হলে সন্ধ্যার আশা করবে না

হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা.) এর দ্বিতীয় উপদেশ হলো, وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ -আর যখন সকালে উপনীত হবে তখন সন্ধ্যার অপেক্ষা করবে না। অর্থাৎ সকালে উপনীত হলে এ সময় যা করার তা করে নিবে। কোনো আমল বা কাজকে সন্ধ্যার জন্য ফেলে রাখবে না এবং এরূপ বলবে না যে, আমি এটি বিকালে করবো। কারণ, হতে পারে তুমি বিকাল পর্যন্ত হায়াত না-ও পেতে পারো।

অসুস্থতার পূর্বে সুস্থতাকে এবং মৃত্যুর পূর্বে জীবনকে কাজে লাগাবে

হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা.) এর তৃতীয় উপদেশ হলো, وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ -তুমি অসুস্থতার পূর্বে সুস্থতাকে এবং মৃত্যুর পূর্বে জীবনকে কাজে লাগাও।

সুস্থতা আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি নিআমত। এ নিআমতকে অনেক সময় মানুষ কাজে লাগাতে পারে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজেই বলেছেন, نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ: الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ -দুটি নিআমতের ক্ষেত্রে মানুষ ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। একটি হলো সুস্থতা, আরেকটি হলো অবসর সময় (বুখারী, হাদীস-৫৯৭০)। এখানে হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা.) অসুস্থতার পূর্বে সুস্থতা নিআমতকে কাজে লাগানোর উপদেশ দিয়েছেন। কারণ, মানুষ যখন সুস্থ থাকে তখন যেরূপ দিল খুলে, ইতমিনানের সাথে ইবাদত-বন্দেগী করতে পারে অসুস্থ হলে সেরূপ করতে পারে না। সুস্থ অবস্থায় আমল করা যত সহজ হয় অসুস্থ অবস্থায় তত সহজ হয় না। অনেক সময় ইবাদত-বন্দেগী ও আমলের ক্ষেত্রে অসুস্থ অবস্থা বাঁধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। এ অবস্থায় কখনো অপারগতা কখনো ক্লান্তি ভর করতে পারে। তাই একজন মুমিনের জন্য সুস্থ অবস্থাকে নিআমত মনে করে এ সময় যথাসাধ্য ইবাদত-বন্দেগীতে নিবিষ্ট হবার চেষ্টা করা উচিত।

এমনিভাবে মৃত্যুর পূর্বে জীবনকে কাজে লাগানো উচিত। এটি হযরত ইবন উমর (রা.) এর নসীহতের অংশবিশেষ। এ বিষয়টি অত্যন্ত সুস্পষ্ট। কারণ, মানুষ যতদিন জীবিত থাকে ততদিন আমল করার সুযোগ পায়। আর যখন মৃত্যুবরণ করে তখন তার আমলের আর কোনো সুযোগ থাকে না। সদকায়ে জারিয়া, নেক সন্তানের দুআ ও উপকারী ইলমের ধারা ও সাওয়াব অব্যাহত থাকলেও কোনো ব্যক্তিগত আমল সে আর করতে পারে না। তাই মৃত্যু আসার আগে জীবনকে কাজে লাগানো উচিত। কিন্তু মৃত্যু কখন আসবে এটি কারো জানা নেই। তাই প্রত্যেক মুহূর্তকে জীবনের শেষ মুহূর্ত মনে করা জরুরি।

অন্য হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ পাঁচটি বিষয়কে অপর পাঁচটি বিষয়ের আগে গনীমত মনে করার নির্দেশনা দিয়েছেন। যেমন, তিনি ইরশাদ করেন,

اغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ: شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ، وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ

-তোমরা পাঁচটি বিষয়কে অপর পাঁচটি বিষয়ের আগে গনীমত মনে করো: বার্ধক্যের আগে যৌবনকে, অসুস্থতার আগে সুস্থতাকে, দারিদ্র্যের আগে সচ্ছলতাকে, ব্যস্ততার আগে অবসরকে এবং মৃত্যুর আগে জীবনকে। (নাসাঈ, আস সুনানুল কুবরা)

আল্লাহ আমাদেরকে জীবন, যৌবন, সুস্থতা, সচ্ছলতা, অবসরসহ সকল নিআমত যথাযথভাবে কাজে লাগানোর তাওফীক দান করুন। আমীন।



সাহাবা

হযরত উসমান ইবন আফফান (রা.)

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও কারামত

মাওলানা মো. ছালিক আহমদ (র.)

নাম উসমান। পিতার নাম আফফান। উপনাম আবূ আব্দিল্লাহ আল কুরাইশী। ইসলামের প্রথম যুগে রাসূলে পাক ﷺ দারে আরকামে প্রবেশের পূর্বে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি সে সমস্ত সাহাবায়ে কিরামের অন্তর্ভুক্ত, যারা আবিসিনিয়ায় ও মদীনা মুনাওয়ারা উভয় স্থানে হিজরত করেছিলেন। তিনি বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি কেননা তাঁর স্ত্রী রাসূলে পাক ﷺ এর কন্যা হযরত রুকাইয়া (রা.) তখন গুরুতর অসুস্থ ছিলেন। তবে বদরের গণীমতের মাল বণ্টনকালে হুযূরে পাক ﷺ তাঁকে অংশ দিয়েছিলেন। তাই ইমাম বুখারী (র.) তাঁর সহীহ বুখারী শরীফে বদরী সাহাবীদের কয়েকজনের তালিকা উল্লেখ করেছেন তাতে হযরত উসমান (রা.) এর নামও অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তাছাড়া তিনি অন্যান্য সকল যুদ্ধে রাসূলে খোদা ﷺ এর সঙ্গে অংশগ্রহণ করেছিলেন। হুদাইবিয়ায়ও তিনি উপস্থিত ছিলেন, তবে বাইআতে রিদওয়ানে অংশগ্রহণ করতে পারেননি। কারণ তাঁকে মহানবী ﷺ সন্ধির জন্য মক্কায় কুরাইশদের নিকট প্রেরণ করেছিলেন। সে ঐতিহাসিক বাইআত মূলত তাঁকে কেন্দ্র করেই সংঘটিত হয়েছিল। তাই রাসূলে কারীম ﷺ তাঁর এক হাত অপর হাতের উপর রেখে বলেছিলেন এ বাইআত আমি উসমানের পক্ষ থেকে গ্রহণ করলাম। তাঁর উপাধি 'যুন নূরাইন'। কারণ তিনি রাসূলে পাক ﷺ এর দুজন কন্যা হযরত রুকাইয়া ও উম্মে কুলসুম (রা.) কে শাদী করেছিলেন। তাঁকে 'জামিউল কুরআন' উপাধিতেও ভূষিত করা হয়। উম্মে কুলসুমের ইন্তিকালের পর রাসূলে পাক ﷺ বলেছিলেন, যদি আমার আরেকজন কন্যা থাকত তাহলে আমি তাকেও উসমান (রা.) এর নিকট শাদী দিতাম। হুযূরে পাক ﷺ তাঁকে বারবার জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। তিনি সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে অন্যতম সেরা ধনাঢ্য সাহাবী ও অত্যন্ত দানবীর ছিলেন। তিনি অত্যন্ত উদার প্রকৃতির ও লজ্জাশীল সাহাবী ছিলেন। দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রা.) এর শাহাদাতের পর চব্বিশ হিজরী সনের মুহাররাম মাসে তিনি ইসলাম জগতের তৃতীয় খলীফা হিসেবে নির্বাচিত হন। তিনি প্রায় বারো বৎসর খিলাফতের দায়িত্ব পালন করে ৩৫ হিজরী সনের যিলহজ্জ মাসের ১৮ তারিখে পবিত্র কুরআন শরীফ তিলাওয়াতরত অবস্থায় বিদ্রোহীদের হাতে শাহাদাতবরণ করেন।

তাঁর মর্যাদায় বর্ণিত হাদীস

সিহাহ সিত্তাহসহ হাদীসের কিতাবসমূহে হযরত উসমান (রা.) এর মর্যাদায় বর্ণিত অনেক হাদীস পাওয়া যায়। নিম্নে দুটো হাদীস উল্লেখ করা হলো।

عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي يَعْنِي فِي الْجَنَّةِ عُثْمَانُ. (رواه الترمذى)

-হযরত তালহা ইবন উবাইদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে পাক ﷺ ইরশাদ করেন, প্রত্যেক নবীর (জান্নাতে) একজন সঙ্গী থাকবে, আর জান্নাতে আমার সঙ্গী হবেন হযরত উসমান (রা.)। (তিরমিযী; মিশকাত, পৃষ্ঠা ৫৬১)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ حَجَّ الْبَيْتَ، فَرَأَى قَوْمًا جُلُوسًا، فَقَالَ: مَنْ هَؤُلَاءِ الْقُعُودُ؟ قَالُوا: هَؤُلَاءِ قُرَيْشٌ. قَالَ: فَمَنِ الشَّيْخُ فِيهِمْ؟ قَالُوا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، فَأَتَاهُ فَقَالَ: يَا ابْنَ عُمَرَ، إِنِّي سَائِلُكَ عَنْ شَيْءٍ أَتُحَدِّثُنِي؟ قَالَ: أَنْشُدُكَ بِحُرْمَةِ هَذَا الْبَيْتِ، أَتَعْلَمُ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَرَّ يَوْمَ أُحُدٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَتَعْلَمُهُ تَغَيَّبَ عَنْ بَدْرٍ وَلَمْ يَشْهَدْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَتَعْلَمُ أَنَّهُ تَخَلَّفَ عَنْ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ فَلَمْ يَشْهَدْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَكَبَّرَ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ :تَعَالَ لِأُخْبِرَكَ وَلِأُبَيِّنَ لَكَ عَمَّا سَأَلْتَنِي عَنْهُ، أَمَّا فِرَارُهُ يَوْمَ أُحُدٍ فَأَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ عَفَا عَنْهُ، وَأَمَّا تَغَيُّبُهُ عَنْ بَدْرٍ، فَإِنَّهُ كَانَتْ تَحْتَهُ رُقَيَّةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَتْ مَرِيضَةً، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ لَكَ أَجْرَ رَجُلٍ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا وَسَهْمَهُ وَأَمَّا تَغَيُّبُهُ عَنْ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ، فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ أَحَدٌ أَعَزَّ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ لَبَعَثَهُ مَكَانَهُ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُثْمَانَ، وَكَانَتْ بَيْعَةُ الرِّضْوَانِ بَعْدَمَا ذَهَبَ عُثْمَانُ إِلَى مَكَّةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى: هَذِهِ يَدُ عُثْمَانَ فَضَرَبَ بِهَا عَلَى يَدِهِ، فَقَالَ هَذِهِ لِعُثْمَانَ. اذْهَبْ بِهَا الْآنَ مَعَكَ. (رواه البخارى، ج-২، ص:১৮৫-২৮৫)

-হযরত আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হজ্জ আদায়কারী এক ব্যক্তি বাইতুল্লাহয় এসে সেখানে একদল লোককে বসা অবস্থায় দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করল, এসব লোক কারা? তারা বললেন, এরা হচ্ছেন কুরাইশ গোত্রের লোক। লোকটি

পুনরায় জিজ্ঞাসা করল এ বৃদ্ধ লোকটি কে? উপস্থিত সকলেই বললেন, ইনি হচ্ছেন আব্দুল্লাহ ইবন উমর। তখন লোকটি তাঁর নিকট গিয়ে বলল, আমি আপনাকে কিছু কথা জিজ্ঞাসা করব, আপনি আমাকে বলে দেবেন কি? এরপর লোকটি বলল, আমি আপনাকে এ ঘরের (বাইতুল্লাহর) মর্যাদার কসম দিয়ে বলছি, উহুদ যুদ্ধের দিন হযরত উসমান ইবন আফফান (রা.) পালিয়েছিলেন, একথা আপনি কি জানেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। লোকটি বলল, তিনি বদরের যুদ্ধে অনুপস্থিত ছিলেন, যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি। একথাও কি আপনি জানেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। লোকটি পুনরায় বলল, তিনি বাইআতে রিদওয়ানেও অনুপস্থিত ছিলেন। একথাও কি আপনি জানেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। বর্ণনাকারী বলেন, লোকটি তখন আল্লাহু আকবার ধ্বনি উচ্চারণ করল। তখন ইবন উমর (রা.) বললেন, এসো, এখন আমি তোমাকে সব ব্যাপারে অবহিত করছি এবং তোমার প্রশ্নগুলোর উত্তর খুলে বলছি।

(এক) উহুদের যুদ্ধ থেকে তার পলায়নের ব্যাপারে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। (দুই) বদর যুদ্ধে তাঁর অনুপস্থিত থাকার কারণ হচ্ছে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কন্যা (রুকাইয়া) তাঁর স্ত্রী ছিলেন। আর তিনি ছিলেন অসুস্থ। তাই তাঁকে নবী করীম ﷺ বলেছিলেন, বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের মতোই তুমি সাওয়াব লাভ করবে এবং গণীমতের অংশ পাবে। (তিন) বাইআতে রিদওয়ানে অনুপস্থিত থাকার কারণ হলো এই যে, মক্কাবাসীদের নিকট উসমান ইবন আফফান থেকে অধিক মর্যাদাসম্পন্ন কোনো ব্যক্তি থাকলে অবশ্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে পাঠাতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ এজন্য উসমান (রা.) কে (মক্কা) পাঠালেন। তাঁর মক্কা গমনের পরই বাইআতে রিদওয়ান সংঘটিত হয়েছিল। তাই বাইআত গ্রহণের সময় নবী করীম ﷺ তাঁর ডান হাতখানা অপর হাতের উপর রেখে বলেছিলেন, এটাই উসমানের হাত। অতঃপর হযরত আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রা.) বললেন, এ হলো হযরত উসমান (রা.) এর অনুপস্থিতির মূল কারণ। এখন তুমি যেতে পারো এবং এ কথাগুলো মনে গেঁথে রেখো। (সহীহ বুখারী, খণ্ড-০২, পৃষ্ঠা: ৫৮১-৫৮২)

হযরত উসমান (রা.) এর কারামত

● হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, হযরত উসমান বিন আফফান (রা.) একদা ভোরবেলা বর্ণনা করলেন যে, আমি গতরাতে রাসূলে পাক ﷺ কে স্বপ্নে দেখলাম, তিনি আমাকে বলছেন, হে উসমান! আজ আমাদের সাথে ইফতার করো। পরবর্তী দিন রোযাদার অবস্থায় হযরত উসমান (রা.) কে শহীদ করা হয়। (কুররাতুল আইনাইন, পৃষ্ঠা ১৩৮)

ঘটনাটি হাকীম বর্ণনা করে আরো লিখেন যে, হযরত উসমান (রা.) স্বপ্নে রাসূলে পাক ﷺ কে বলতে শুনেছেন যে, হে উসমান! তুমি শুক্রবারে আমার নিকট এসে যাবে। সুতরাং তিনি শুক্রবারে রোযা অবস্থায় শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করেন। তার স্বপ্নটি সরাসরি বাস্তবায়িত হওয়া তার সুস্পষ্ট কারামতই প্রমাণ করে।

● হযরত আবূ রাফি থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা (খাইবার বিজয়ের দিন) হযরত আলী (রা.) এর সঙ্গে ছিলাম, যখন রাসূলে পাক ﷺ (কামূস দুর্গ বিজয়ের জন্য) তাঁর হাতে ইসলামের পতাকা তুলে দিয়েছিলেন। তিনি যখন দুর্গের নিকটবর্তী হলেন তখন তার অধিবাসীরা বের হয়ে আসল এবং তাঁর সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ল। এমতাবস্থায় ইয়াহুদীদের এক ব্যক্তি হযরত আলী (রা.) এর উপর আক্রমণ করে তার হাত থেকে ঢাল ফেলে দিল। তখন হযরত আলী (রা.) দুর্গের একটি দরজা টান মেরে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে লাগলেন, ফলে আল্লাহ পাক তাঁদেরকে বিজয় দান করলেন। যুদ্ধ শেষে দরজাটি দূরে নিক্ষেপ করে দিলেন। হযরত আবূ রাফি (রা.) বলেন, উক্ত যুদ্ধে আমার সাথে আরও সাতজন ছিলেন। আমরা এ আটজন মিলে পরবর্তীতে উক্ত দরজাটিকে উলটানোর চেষ্ট করি (যে দরজাটি হযরত আলী (রা.) এক হাত দিয়ে যুদ্ধে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন।) কিন্তু আমরা আটজন মিলেও তা উলটাতে পারিনি। এটা ছিল শেরে খোদা হযরত আলী (রা.) এর একটি সুস্পষ্ট কারামত। (আহমদ)

● ইমাম বাইহাকী (র.) দালাইলুন নুবুওয়াত গ্রন্থে হযরত আলী (রা.) থেকে দীর্ঘ বর্ণনার শেষে উল্লেখ করেন, যখন রাসূলে পাক ﷺ এর ওফাত হলো তখন কান্নাকাটি শুরু হলো এমতাবস্থায় সাহাবায়ে কিরাম ঘরের এক কোণ থেকে একটি আওয়াজ শুনলেন, তোমাদের উপর আল্লাহর রহমত, বরকত ও শান্তি বর্ষিত হোক, আল্লাহ তাআলা সকল সমস্যা দূরীভূত করেন, তিনি তার বান্দাদের সকল চিন্তা দূর করেন, সকল হারানো বস্তুর তিনিই উত্তম প্রতিদান হয়ে থাকেন। সুতরাং তাঁকেই ভয় কর এবং তাঁর নিকটই প্রত্যাশা করো। কেননা বিপদগ্রস্ত তো সেই ব্যক্তিই হয়ে থাকে, যে সাওয়াব বা পূণ্য থেকে বঞ্চিত হয়। তখন হযরত আলী (রা.) উপস্থিত সকলকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি চিনতে পেরেছ তিনি কে? তিনি হচ্ছেন হযরত খাদ্বির (আ.)।

● হযরত আলী (রা.) কর্তৃক হযরত খাদ্বির (আ.)কে (যিনি প্রসিদ্ধ মত অনুযায়ী একজন ওলী) চিনতে পারা তার একটি সুস্পষ্ট কারামত হিসেবে পরিগণিত হয়। (মিশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা ৫৫০)

Al Arab Tailors

মো. আনোয়ার হোসেন
প্রোপ্রাইটর

আল আরব টেইলার্স
পাঞ্জাবী স্পেশালিস্ট

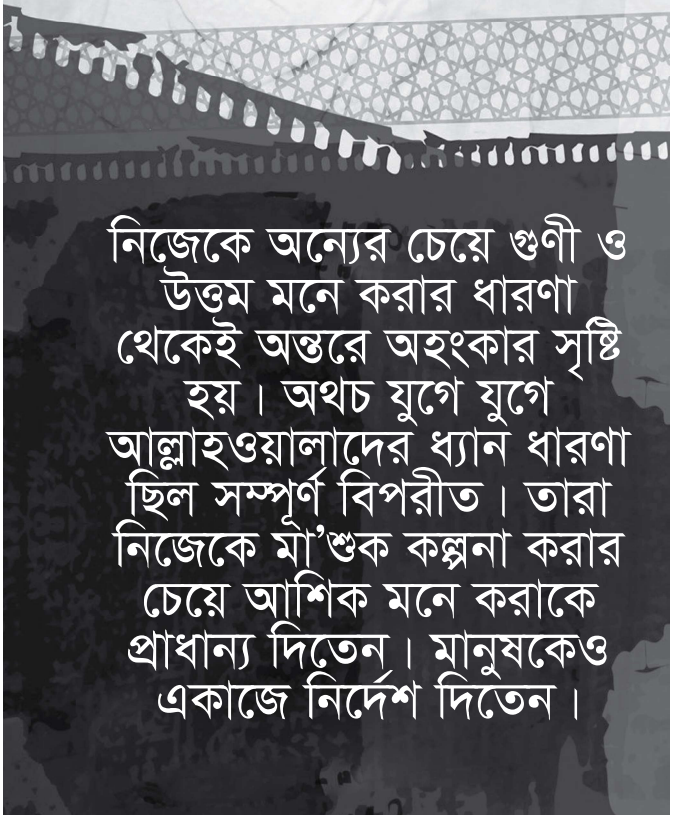
১১৮, করিম উল্লাহ মার্কেট (নিচ তলা)
বন্দর বাজার, সিলেট

01734-346601

প্রবন্ধ

আত্মপ্রদর্শন নয় বিনয়ই তাসাওউফের মূলকথা

মুফতী গিয়াস উদ্দিন চৌধুরী



ভূমিকা

সমাজে কিছু পরহেযগার মানুষের অবস্থা এমন যে, তারা প্রকাশ্যে সকল সৎ কাজ করে থাকেন। নফল নামায, নফল রোযা, নিয়মিত তাসবীহ ইত্যাদি করে থাকেন। সাধারণ পোশাক পরিধান করেন এবং অল্প আহার করেন। কিন্তু তারা নিজেকে হিংসা, কু-প্রবৃত্তি, রিয়া ইত্যাদি থেকে মুক্ত রাখতে পারেন না। তারা পছন্দ করেন মানুষ তাদের নিকটে আসুক এবং তাদের ভক্তি-শ্রদ্ধা করুক। এজন্য তারা বাহ্যিকভাবে ইবাদতগুযার হলেও তারা তাদের অন্তরকে পরিশুদ্ধ করতে পারেন না। অর্থাৎ তাদের পক্ষে তাসাউফের মূল লক্ষ্যে পৌঁছা সম্ভব হয় না।

ইমাম গাযালী (র.) বলেন, কতক পরহেযগার আবিদের অবস্থা এই যে, তারা সাধারণ পোশাক পরিধান করে, অল্প আহার করে এবং ধনাসক্তি পরিহার করে। কিন্তু লোকের ভক্তি ও সম্মান পাওয়ার লোভ তারা সংবরণ করতে পারে না। লোকজন বরকত লাভের আশায় তাদের কাছে আগমন করলে তারা সন্তুষ্ট হন এবং লোক-সম্মুখে নিজেদের বেশ সাজিয়ে রাখেন। তারা জানে না যে, ধনাসক্তি অপেক্ষা সম্মান-মর্যাদার লিপ্সা দমন করা কষ্টসাধ্য। কারণ সম্মান-লালসায় মুগ্ধ হয়ে মানুষ অম্লান বদনে সকল কষ্ট সহ্য করে। যে ব্যক্তি সম্মান, লিপ্সা ও প্রভুত্ব প্রিয়তা পরিত্যাগ করতে পেরেছেন, তিনিই যথার্থ মুত্তাকী বা পরহেযগার। (কিমিয়ায়ে সাআদাত)

এক শ্রেণির আবিদ প্রকাশ্যভাবে সকল সৎকার্য করে থাকে। যেমন- প্রত্যহ হাজার রাকাআত নফল নামায পড়ে, হাজার তাসবীহ পাঠ করে, সমস্ত রাত্রি জেগে ইবাদত করে এবং প্রত্যহ রোযা রাখে। কিন্তু কু-প্রবৃত্তি থেকে হৃদয় পবিত্র করতে যত্নবান হয় না। অতএব তাদের হৃদয় ঈর্ষা, রিয়া, অহংকার ইত্যাদি কু-প্রবৃত্তিতে পরিপূর্ণ থাকে। এ ধরনের আবিদ বদমেজাজি ও কর্কশ স্বভাবী হয়ে থাকে। (কিমিয়ায়ে সাআদাত)

উক্ত প্রবন্ধে কিছু হাদীস এবং বুযুর্গানে কিরামের বাণী তুলে ধরা হয়েছে যাতে আমলের প্রকৃত উদ্দেশ্য সঠিকভাবে বুঝা যায় এবং তাসাওউফের মমার্থ অনুধাবন করা যায়।

আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে দিলের অবস্থার পরিবর্তনের জন্য বুযুর্গানে কিরামের কথাগুলো থেকে শিক্ষা গ্রহণ করি এবং আমি চাই তরীকতের ভাইগণও যাতে বুযুর্গানে কিরামের কথা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেন।

তাসাউফের মর্মকথা

হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- ثلاث منجيات، وثلاث مهلكات. فأما المنجيات : فتقوى الله في السر والعلانية، والقول بالحق في الرضا والسخط، والقصد في الغنى والفقر. وأما المهلكات: فهوى متبع، وشح مطاع، وإعجاب المرء بنفسه، وهي أشدهن–

-তিনটি জিনিস পরিত্রাণকারী এবং তিনটি জিনিস ধ্বংসকারী। পরিত্রাণকারী জিনিসগুলো হচ্ছে-১। প্রকাশ্যে গোপনে আল্লাহকে ভয় করা ২। সন্তুষ্ট ও অসন্তুষ্ট উভয় অবস্থায় উচিত কথা বলা ৩। ধনী ও দরিদ্র উভয় অবস্থায় মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা। ধ্বংসকারী জিনিসগুলো এই- ১। প্রবৃত্তির অনুসারী হওয়া ২। লোভ-লালসা করা ৩. কোনো ব্যক্তি নিজেকে নিজে সম্মানিত মনে করা। আর এ স্বভাবটিই সবচেয়ে খারাপ স্বভাব। (বাইহাকী শরীফ)

'আশিক' হচ্ছেন ঐ ব্যক্তি যে কারো প্রতি আন্তরিক মহব্বত রাখেন, আর মা'শুক হচ্ছেন ঐ ব্যক্তি যার প্রতি ভালোবাসার

সম্পর্ক রাখা হয়। দেখা যায় সাধারণতঃ কিছু মানুষ চায় মা'শুক হতে, অর্থাৎ তাকে মানুষ ভালোবাসুক, তার প্রতি আন্তরিক মহব্বত রাখুক, তাকে অনুসরণীয় মনে করুক। কিন্তু এটা চিন্তা করে না যে, তার মধ্যে কী এমন বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যার ফলে মানুষ তার প্রতি আসক্ত হবে। নিজেকে অন্যের চেয়ে গুণী ও উত্তম মনে করার ধারণা থেকেই তার অন্তরে অহংকার সৃষ্টি হয়। অথচ যুগে যুগে আল্লাহওয়ালাদের ধ্যান ধারণা ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। তারা নিজেকে মাশুক কল্পনা করার চেয়ে আশিক মনে করাকে প্রাধান্য দিতেন। মানুষকেও একাজে নির্দেশ দিতেন।

এ প্রসঙ্গে মাওলানা রূমী (র.) মসনবী শরীফে লিখেন- মা'শুকিয়ত ছেড়ে দাও, আশিকী গ্রহণ কর। তা না হলে পরিমাপ করতে হবে যে, ঘাড় কত লম্বা, বক্ষ কত প্রশস্ত, নাক কত দীর্ঘ, চোখ কেমন। কিন্তু আশিক হলে কোনো কিছুর পরিমাপের প্রয়োজন নেই। কারণ আশিকদের কোনো হিসাব করতে হয় না। একজন কালো ও অসুন্দর ব্যক্তিও আশিক হতে পারবে। মাওলানা রূমী (র.) আরো বলেন, তুমি 'মা'শুক' হয়ো না, নিজের সৌন্দর্য ও পূর্ণতার দিকে দৃষ্টি দিবে না যে, আমিই বড় মুত্তাকী, ইবাদতকারী ও পরহেযগার। তোমার সকল সৌন্দর্যে ত্রুটি বের হয়ে আসতে পারে। তাহলে তুমি আল্লাহর মহানত্বকে গৌরবের যোগ্য, ইবাদতের যোগ্য মনে করতে পারবে না। তাই আশিক হয়ে যাও। আপাদমস্তক ত্রুটিযুক্ত হয়েও বান্দাহ আল্লাহর আশিক হতে পারে। আশিক ব্যক্তি বলে থাকেন, হে আল্লাহ! আমার ভেতর কোনো সৌন্দর্য নেই, কিন্তু আমি তোমাকে মহব্বত করি। আল্লাহ তাআলাকে বিনয়ের সাথে পছন্দ করি।

তবে আশিক হওয়ার অর্থ এই নয় যে, তিনি মা'শুক হতে পারবেন না। বরং আল্লাহ তাকে মা'শুক বানিয়ে দিবেন।

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক দীর্ঘ হাদীসে বর্ণনা করেন,

وما أَقْبَلَ عَبْدٌ بِقَلْبِهِ إِلَّا جَعَلَ قُلُوبَ الْمُؤْمِنِينَ تَقَادُ إِلَيْهِ بِالْوُدِّ وَالرَّحْمَةِ، وَكَانَ الله تعالى إِلَيْهِ بِكُلِّ خَيْرٍ أَسْرَعَ– (الطبرني)

-যখন কোনো ব্যক্তি তার অন্তরকে আল্লাহ তাআলার দিকে ধাবিত করে দেয়, তখন আল্লাহ তাআলা ভালোবাসা ও অনুগ্রহ সহকারে মুমিন বান্দাহদের অন্তর তার দিকে ধাবিত করে দেন। আর সকল কল্যাণকর বিষয় আল্লাহ তাআলা তার নিকট দ্রুত পৌঁছিয়ে দেন। (তাবারানী)

ইমাম নববী (র.) তার রিয়াদুস সালিহীনে ইমাম মুসলিম (র.) হতে একটি বর্ণনা নকল করেছেন। এই বর্ণনা থেকে বুঝা যায়। হযরত উয়াইস আল কারনী (র.) কে মানুষ চিনে ফেলেছিল যখন হযরত উমর (রা.) মানুষের কাছে তাঁর পরিচয় তুলে ধরলেন আর তখন তিনি একেবারে লোকচক্ষুর অন্তরাল হয়ে গেলেন। এরপূর্বেও তিনি মানুষের চোখের আড়ালে থাকতে পছন্দ করতেন। কিন্তু উয়াইস আল কারনী (র.) আজও পর্যন্ত মানুষের অন্তরে স্থান করে নিয়েছেন মা'শুক হিসেবে। উমর (রা.) রাসূল ﷺ এর যবান থেকে তার কথা শুনে আশিক হয়ে উয়াইস আল কারনী (র.) এর সাথে দেখা করেন এবং তাকে দিয়ে দুআ করান।

যারা মা'শুক হওয়ার মন-মানসিকতা রাখেন তাদের বদঅভ্যাস হচ্ছে তারা নিজের প্রশংসা নিজেরা করে থাকেন এবং তারা চান তাদের প্রশংসা অন্যজন করুক।

এ প্রসঙ্গে ফরীদুদ্দীন আত্তার (র.) তার একটি কবিতায় লিখেছেন- নিজে নিজের প্রশংসা করা শয়তানের কাজ। যে নিজেকে ছোট মনে করে সেই প্রকৃত মানুষ। শয়তান বলেছিল আমি আদমের চেয়ে উত্তম। এ কারণে সে কিয়ামত পর্যন্ত অভিশপ্ত হয়েছে। বিনয় থেকেই মাটি আদম হওয়ার মর্যাদা লাভ করে। আগুনের আলো অহংকারে ম্লান হয়ে যায়। শয়তান অহংকার করে অভিশপ্ত হয়েছে আর আদম ক্ষমা প্রার্থনা করে সৌভাগ্যবান হয়েছেন।

কামিল না হয়েও নিজেকে কামিল হিসেবে প্রকাশ করার অপচেষ্টাকারীদের উদ্দ্যেশ্যে রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেন, হযরত আসমা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يَنَلْ كَلابِس ثوبي زور–

-যে ব্যক্তি যা তাকে প্রদান করা হয়নি তা লাভ করার ভান করল সে ব্যক্তি যেন দুটি মিথ্যার পোশাক পরিধান করল। অর্থাৎ লুঙ্গি এবং চাদর উভয়টি, যার উদ্দেশ্য হচ্ছে আগাগোড়াই সে মিথ্যাবাদী বা কপট। (তিরমিযী ব্যতীত সিহাহ সিত্তাহর সকল কিতাবেই হাদীসখানা বর্ণিত হয়েছে)

ইমাম আবুল কাশিম কুশাইরী (র.) বলেন, আলী ইবন আবদুল হুমাইদ বলেন, আমি সিররীর নিকট শুনেছি তিনি বলেন, যে ব্যক্তি বাস্তবে যেমন নয় এমনভাবে নিজেকে সুসজ্জিত করে উপস্থাপন করল, সে ব্যক্তি আল্লাহর দৃষ্টি থেকে যেন (ছিটকে) পড়ে গেল। (আর রিসালাতুল কুশাইরিয়্যা)

ঐ সমস্ত অপরিপক্ক লোকদের উদ্দ্যেশ্যে আল্লামা ইকবাল বলেন- পুনরায় সত্যবাদিতা, ন্যায়পরায়ণতা, সাহসিকতার সবক গ্রহণ করো। তাহলে দুনিয়ার নেতৃত্বের কাজ তোমাকে দেওয়া হবে।

পূর্বে বর্ণিত হাদীসে 'যা লাভ করেনি বা যা তাকে প্রদান করা হয়নি' বাক্যটি রূপকার্থবোধক এবং এর দ্বারা আধ্যাত্মিক বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত। কাজেই যে ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে কামিল নন অথচ কথায়, কাজে ও আচরণে কামিল বা বুযুর্গ হওয়ার ভান করে তাকেও নিন্দা করা হয়েছে।

মাওলানা জালালুদ্দীন রূমী (র.) যারা নিজেদেরকে বুযুর্গ মনে করেন কিন্তু বাস্তবে তাদের মধ্যে এর কিছুই নেই, তাদের উদ্দেশ্যে লিখেন-

-আমাদের বাহ্যিক অবস্থা ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যার ভাষা চাকচিক্যময় অথচ অন্তর কলুষিত।

-তার মধ্যে আল্লাহর তরফ থেকে মারিফাতের নাম গন্ধও নেই। অথচ হযরত শীস ও আদম (আ.) এর চেয়ে অধিক পরিমাণে দ্বীনী দাওয়াত ও তাবলীগ করে থাকে।

-(কাশফ) কারামতের অবস্থা এই যে, শয়তানও কখনো নিজেকে স্বীয় আকৃতি দেখায় না, অথচ তার দাবি এই যে, আমি আবদাল, কুতুব (অলীদের উচুস্তর) হতেও অগ্রগামী।

-বুযুর্গানে দ্বীনের অনেক বাণী চুরি করে নিজের করে নিয়েছে, যাতে সাধারণ মানুষ মনে করে সে অনেক বড় বুযুর্গ।

-স্বীয় খ্যাতি বর্ধিত করার মানসে বায়েযীদ বুস্তামীর মতো ওলীদেরও ভুল-ত্রুটি খুঁজে বেড়ায়। তার অন্তর দর্শনে ইয়াযীদের মতো অন্তরও লজ্জিত হয়ে যায়।

মাওলানা জালালুদ্দীন রূমী (র.) আরো বলেন,

-(মায়া কান্না উপকারী নয় বরং) প্রার্থিত বস্তু অন্তরের কান্নার উপর নির্ভরশীল। কাকুতি মিনতি সহকারে দু'আ ব্যতীত সফলতা লাভ করা অতি দুরূহ। (মসনবী শরীফ)

সত্যিকারার্থে যারা বুযুর্গ তারা মাঝে মাঝে শুকরিয়া হিসেবে নিআমতের আলোচনা করেন। কারণ আল্লাহ তাআলার নির্দেশ হচ্ছে, নিয়ামতের কথা বর্ণনা করা। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন- وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ

অভ্যন্তরীণ পরিশুদ্ধতার বিষয়ে 'আর রিসালাতুল কুশাইরিয়াহ' গ্রন্থে ইমাম আবুল কাশিম কুশাইরী (র.) বলেন,

-উস্তায আবূ আলী দাক্কাক থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, অন্তরের পরিশুদ্ধি (বা ইখলাস) হলো লোকজনের দৃষ্টি থেকে বেঁচে থাকা। আর সত্য হলো এমন বিষয় যে, তোমার নফস তোমার আমল দেখতে পায় না। কাজেই মুখলিস বা অভ্যন্তরীণ পরিশুদ্ধি অবলম্বনকারীর 'রিয়া' বা লোক দেখানো কোনো বিষয় থাকে না। আর সত্যবাদীর মধ্যে কোনো ধরনের অহংকার থাকে না। (আর রিসালাতুল কুশাইরিয়া)

যুন্নুন মিসরী বলেন,
-ইখলাস বা অভ্যন্তরীণ পরিশুদ্ধির চিহ্ন তিনটি। (১) জনসাধারণের নিন্দা ও প্রশংসা সমান মনে করা (২) আমলের মধ্যে নিজের আমলকে গণ্য করা ভুলে যাওয়া ও (৩) পরকালে নিজের আমলের সাওয়াব পাওয়ার বিষয়টি ভুলে যাওয়া। (আর রিসালাতুল কুশাইরিয়্যা)

হুযাইফা মারআশী বলেন,
-ইখলাস বা অভ্যন্তরীণ পরিশুদ্ধতা হলো বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ আমল এক রকম হওয়া। কেউ কেউ বলেন, যা দ্বারা একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাকে উদ্দেশ্য করা হয় তাই ইখলাস। এর দ্বারা সত্যও উদ্দেশ্য হয়। আবার কারো কারো মতে আমল প্রত্যক্ষ করা থেকে চক্ষু বন্ধ রাখা। (আর রিসালাতুল কুশাইরিয়্যা)

বর্ণিত সবগুলো ঘটনাই অভ্যন্তরীণ পরিশুদ্ধির গুরুত্বের দিকে ইঙ্গিত করে।

এ প্রসঙ্গে আল্লামা ইকবাল বলেন,
-সম্প্রদায়ের উপদেশদাতাদের উপদেশে কোনো দৃঢ়তা নেই। প্রাণকে তাড়িত করে এমন কোনো শক্তি নেই, নেই কোনো জ্বালাময়ী ভাষণ। আযানের ধ্বনি অবশিষ্ট আছে কিন্তু বেলালের সেই রূহানিয়াত নেই। দর্শন তো আছে কিন্তু গাযালীর সে তালকীন অবশিষ্ট নেই। (জওয়াবে শিকওয়াহ)

অভ্যন্তরীণ বিষয়ের পরিশুদ্ধি প্রসঙ্গে ইমাম গাযালী (র.) এর 'কিমিয়ায়ে সাআদাত' কিতাবে বর্ণিত আরেকটি ঘটনা হচ্ছে-
-কতিপয় আলিম বক্তৃতা করে বেড়ান। তাদের বক্তৃতা ছন্দময় এবং সূক্ষ্ম তত্ত্বসমৃদ্ধ অথচ অসার কথায় পূর্ণ। বক্তৃতাকালে তারা এমন সুন্দর সুন্দর শব্দ ব্যবহার করেন যাতে শ্রোতামণ্ডলী তাদেরকে বাহবা দেয় এবং বক্তৃতার প্রশংসা করে। শ্রোতার হৃদয়ে পরকালের ভয়ের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করে দেওয়া যাতে পরকালের শাস্তি তাদের চোখের উপর প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে এবং তারা পরকালের ভয়ে রোদন করতে থাকে, এটিই যে উপদেশ প্রদানের উদ্দেশ্য তারা তা উপলব্ধি করেন না। (কিমিয়ায়ে সাআদাত)

সূফী কবি মাওলানা জালালুদ্দীন রূমী (র.) বলেন,
-ভিক্ষুক রুটির জন্য আল্লাহর নাম নেয়। খোদাভীরু বান্দাহ অন্তরের অন্তস্থল থেকে আল্লাহর নাম নেয়।

-তুমি রুটি রোজগার করার জন্য আল্লাহ আল্লাহ করছো। লোভ ছেড়ে সামনে অগ্রসর হও আর আল্লাহকে ডাকতে থাক। (মসনবী শরীফ)

অনুরূপভাবে কারো বাহ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি দেখে তাকে পরিমাপ করা ঠিক নয়। কেননা বাহ্যিকভাবে কেউ খুবই পরিপাটি ও ইবাদত গোযার হতে পারে। কিন্তু তার অন্তর বাহিরের চেয়ে বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

ইমাম বুখারী (র.) একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন- কোনো এক যুদ্ধে নবী করীম ﷺ এর সাথে কাফিরদের মুকাবিলা হয়, তখন 'কাযমান' নামক এক ব্যক্তি সাহাবীদের সেনাবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। সে ছিল অভ্যন্তরীণভাবে মুনাফিক। সে এ যুদ্ধে মুশরিকদের সাথে প্রাণপণ যুদ্ধ করে খুবই যশ ও খ্যাতি প্রদর্শন করেছিল। তখন হযরত সাহাল ইবন সা'দ সায়েদী নামক একজন সাহাবী বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আজ আমাদের মধ্যে অমুক ব্যক্তি যেরূপ বীরত্ব প্রদর্শন করেছে অন্য কেউ অনুরূপ বীরত্ব প্রদর্শন করেনি। নবী করীম ﷺ এ কথা শুনে ইরশাদ করেন- أَمَا أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ অর্থাৎ শুনে রাখ! সে তো জাহান্নামী।

পরিশেষে ঐ ব্যক্তি কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করতে করতে মারাত্মকভাবে আহত হয় এবং আহত হওয়ার কষ্ট সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করে।

হাফিয আসকালানী (র.) এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন, এ হাদীসের শিরোনামের সাথে এই সামঞ্জস্য রয়েছে যে, ঐ ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার জন্য যুদ্ধ করেনি, বরং জাতীয় ও গোত্রীয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ করেছে। তাই এ ধরনের ব্যক্তিকে শহীদ বলা যায় না। (ফাতহুল বারী)

অন্য একটি হাদীসে এসেছে- হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর যুগে একজন লোক ছিল যার ইবাদত ও মুজাহাদা আমাদেরকে আশ্চর্য করত। আমরা তার নাম ও গুণাবলি উল্লেখ করে রাসূলের কাছে তার পরিচয় তুলে ধরলাম কিন্তু তিনি তাকে চিনতে পারলেন না। একদিন আমরা তার আলোচনা করছি, এমন সময় লোকটি আমাদের নিকট উপস্থিত হলো। আমরা বললাম, এই সেই ব্যক্তি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা আমার কাছে এমন ব্যক্তির সংবাদ দিচ্ছে যার চেহারায় শয়তানী রং মিশ্রিত। ঐ ব্যক্তি এসে তাঁর পাশে দাঁড়ালো, কিন্তু সালাম দিলো না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আল্লাহর কসম! তুমি যখন মজলিসের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলে তখন কি তুমি মনে মনে এই কথা বলনি যে, এই দলের মধ্যে তোমার চেয়ে উত্তম কোনো লোক নেই। সে বলল, হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল। এরপর সে নামায পড়তে লাগল।

অন্য এক বর্ণনায় আছে, এরপর সে মসজিদের এক পাশে চলে গেল ও নামাযের প্রস্তুতি নিল, পা সোজা করল এবং নামায পড়তে শুরু করল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, কে আছে ঐ লোকটিকে হত্যা করবে? হযরত আবূ বকর (রা.) বললেন, আমি (তাকে হত্যা করব)। এরপর তিনি তার কাছে গেলেন এবং নামাযরত পেলেন আর বলতে লাগলেন, সুবহানাল্লাহ! নামাযরত ব্যক্তিকে কীভাবে আমি হত্যা করব অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাযী ব্যক্তিকে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন। হযরত আবূ বকর (রা.) বের হয়ে এলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি কী করেছ? তিনি জবাব দিলেন, আমি নামাযরত অবস্থায় হত্যা করতে অপছন্দ করি। কারণ আপনি নামাযীদেরকে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন। অতঃপর উমর (রা.) বললেন, আমি তাকে হত্যা করব। তিনি প্রবেশ করলেন এবং তার চেহারা অবনমিত অবস্থায় পেলেন। আর বললেন, সে আমার চেয়ে উত্তম। এই বলে তিনি বের হয়ে এলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি কী করেছ? তিনি বললেন, আমি তাকে চেহারা অবনমিত অবস্থায় পেলাম এ কারণে তাকে হত্যা করা অপছন্দ করলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, কে আছে এই লোকটিকে হত্যা করবে? হযরত আলী (রা.) বললেন, আমি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমিই তাকে হত্যা করবে যদি তাকে পাও। হযরত আলী (রা.) ভিতরে গেলেন এবং দেখলেন লোকটি চলে গেছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে ফিরে এলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, তুমি কী করেছ? তিনি বললেন, আমি গিয়ে দেখলাম সে চলে গেছে। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যদি তাকে হত্যা করা হতো তাহলে আমার উম্মতের দুই ব্যক্তির মধ্যে বিরোধ দেখা দিত না। সেই হতো ফিতনার ক্ষেত্রে প্রথম ও শেষ। বর্ণনাকারী মূসা বলেন, আমি মুহাম্মদ বিন কা'বকে বলতে শুনেছি, ঐ স্তনবিশিষ্ট লোকটিকে হযরত আলী (রা.) হত্যা করেছেন। (মুসনাদে আবি ইয়ালা, আবদুর রাযযাক ও আবূ নুআইম)

সারকথা হলো হাদীসে বর্ণিত ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে কামিল বা মর্যাদাবান ব্যক্তি ছিল না সে খারেযী ছিল এবং সে নিজেকে কামিল মনে করত, যে কারণে নবী করীম ﷺ তাকে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। (আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

বাংলাদেশে ইসলামবিদ্বেষ : কারণ ও করণীয়

মারজান আহমদ চৌধুরী

এক. বাংলাদেশে ইসলামবিদ্বেষ

বাংলাদেশের রাষ্ট্র-রাজনীতি, বুদ্ধিজীবীমহল, মিডিয়া সর্বত্র এক ধরণের সুপ্ত ইসলামবিদ্বেষ লক্ষ্যণীয়। এত প্রকটভাবে এখনও প্রকাশিত না হলেও দেশের প্রচলিত রাজনৈতিক বয়ানে ইসলামকে এক ধরণের হেয় প্রতিপন্ন করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এর পেছনে রয়েছে একটি ঐতিহাসিক ভুল ন্যারেটিভ।

১৯৭২ সালের সংবিধানে জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাকে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। একইসাথে সংবিধানের প্রস্তাবনায় বলা হয়, এসব আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে বাংলাদেশের মানুষ মুক্তিযুদ্ধ করেছিল। তখন থেকে একটি বয়ান তৈরি করা হয় যে, ইসলামী বা ইসলামপন্থি রাষ্ট্র পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে সেক্যুলার রাষ্ট্র বাংলাদেশের জন্ম হয়েছে। দেশের প্রায় সব সেক্যুলার লেখক, গবেষক, বুদ্ধিজীবীর লেখায় এই বয়ানটি কোনো না কোনোভাবে হাযির হবেই। তাঁরা সেক্যুলারিজম তথা ধর্মনিরপেক্ষতাকে এক ধরনের নিরপেক্ষ ও সার্বজনীন আদর্শ হিসেবে বিবেচনা করে, সেই জায়গা থেকে ইসলামকে এর বিপরীত হিসেবে হাযির করান। তাঁরা দেখান যে, বাংলাদেশের সূচনালগ্নে ইসলাম প্রাসঙ্গিক কোনো সামাজিক-রাজনৈতিক শক্তি ছিল না। ১৯৭৯'র দশকের শেষদিকে সামরিক শাসনের সময় রাজনৈতিক সুবিধা লাভের আশায় জিয়াউর রহমান ইসলামকে রাজনীতিতে নিয়ে এসেছেন। অথচ এই পুরো বয়ানটি সর্বৈব মিথ্যা। বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ তথা মুসলমানরা অন্তত সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার (সেক্যুলারিজম) চেতনায় কোনোদিনও উদ্বুদ্ধ ছিল না এবং এসব বিদেশি চেতনা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের আদর্শও ছিল না। উলটো ইংরেজ আমল থেকেই বাংলা অঞ্চলের মুসলমানদের মধ্যে একটি শক্তিশালী মুসলিম-চেতনাবোধ জন্ম নিয়েছিল। বাংলাপিডিয়ার তথ্যমতে, উপমহাদেশের আযাদী সংগ্রামের প্রতিকৃত সায়্যিদ আহমদ শহীদে বালাকোট (র.) ১৮২০ সালে যখন কলকাতায় এসেছিলেন, তখন অন্তত দশ হাজার বাঙালি মুসলমান তাঁর হাতে বাইআত করে তাঁর আন্দোলনে সমর্থন দিয়েছিলেন। সায়্যিদ আহমদের শিষ্যদের মধ্যে সায়্যিদ নিসার আলী তিতুমীর, নূর মুহাম্মদ নিযামপুরী, কারামত আলী জৌনপুরী (র.) প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের বহুমুখী প্রচেষ্টার ফলে তরীকায়ে মুহাম্মাদিয়া বাংলা অঞ্চলের মুসলমানদের জন্য পরিচয়, চেতনা ও প্রতিবাদের এক হাতিয়ার হয়ে সামনে এসেছিল। একইভাবে ফারাইযি আন্দোলনও বাংলার নিপীড়িত শ্রেণির মুসলমানদের মাঝে বেশ সাড়া ফেলেছিল।

পাকিস্তান আমলে পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমানরা এমন একটি আন্দোলনও করেনি, যেখানে ইসলামকে বাংলার মানুষের পরিচয়, সংস্কৃতি, আকাঙ্ক্ষা বা জাতীয়তাবোধের বিরুদ্ধে দাঁড় করানো হয়েছিল। কিংবা এমন একটি রাজনৈতিক আন্দোলনও দেখানো যাবে না, যেখানে ইসলামী বা ইসলামপন্থি রাষ্ট্র পাকিস্তান থেকে আলাদা একটি সেক্যুলার রাষ্ট্র তৈরি করার কথা কেউ বলেছিল। আওয়ামী মুসলিম লীগের ৭ দফা, পরবর্তীতে আওয়ামীলীগের ৪২ দফা, ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা নির্বাচনি ইশতেহার, শেখ মুজিবুর রহমানের ৬ দফা, ছাত্রদের ১১ দফা, আওয়ামীলীগের ১৯৭০ সালে নির্বাচনি ইশতেহার, ১৯৭১ সালে প্রবাসী সরকারের প্রচারিত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র কোথাও ইসলামের প্রতি ন্যূনতম বিরোধিতা কিংবা সেক্যুলার ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কোনো আলাপই ছিল না। বরং দাবি ছিল, পশ্চিম পাকিস্তানের বৈষম্যের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের অধিকার আদায় করা। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে ১৯৭২ সালে প্রণীত বাংলাদেশের সংবিধানে সেক্যুলারিজম ও সমাজতন্ত্রকে স্বাধীনতা যুদ্ধের অনুপ্রেরণা ও রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি বানিয়ে হাযির করা হয়। অথচ একটু গভীরভাবে দেখলে বুঝা যায়, ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ এজন্য হয়নি যে, পাকিস্তান ইসলামী রাষ্ট্র ছিল। বরং এজন্য হয়েছিল যে, যে ইসলামী রাষ্ট্রের স্বপ্ন নিয়ে বাঙালি মুসলিম নেতৃবৃন্দ ১৯০৬ সালে ঢাকায় মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যে স্বপ্ন নিয়ে তাঁরা পাকিস্তান সৃষ্টির আন্দোলন করেছিলেন, সেই স্বপ্ন পূরণ হয়নি। পাকিস্তান প্রকৃত অর্থে একটি ইসলামী আদর্শের রাষ্ট্র হতেই পারেনি। উলটো একটি বৈষম্যমূলক নিপীড়ক রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছিল। তাই পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী তথা পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ পাকিস্তান থেকে আলাদা হয়েছে।

আমার মনে হয়, বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে যে সুপ্ত ইসলামবিদ্বেষ আছে, তা মূলত এই ভুল ন্যারেটিভে বিশ্বাস করার কারণে তৈরি হয়েছে। যদিও শেখ মুজিবুর রহমান ও ১৯৭২ সালের সংবিধান প্রণয়ন কমিটির প্রধান কামাল হোসেন সেক্যুলারিজমকে "ইসলাম বিরোধিতা নয়" বলে আখ্যায়িত করেছেন, তবুও ওই ভুল ন্যারেটিভের কারণে বারবার বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ইসলামবিদ্বেষ দেখা গেছে।

সম্ভবত বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে লম্বা সময়জুড়ে একটি সিস্টেমেটিক ইসলামবিদ্বেষ দেখা গেছে বিগত হাসিনা সরকারের আমলে। রাষ্ট্র, রাজনীতি, বিচারব্যবস্থা, প্রশাসন, পুলিশ, শিক্ষাব্যবস্থা, বুদ্ধিজীবীমহল, মিডিয়া সর্বত্র ইসলাম ও ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের বিরুদ্ধে এই পরিমাণ সুপ্ত বিদ্বেষ তৈরি করা হয়েছে, যা ইতিপূর্বে কখনও দেখা যায়নি। ইদানীং উগ্র হিন্দুত্ববাদী ইসকন যে আস্ফালন করছে, তা ওই সিস্টেমেটিক ইসলামবিদ্বেষের বেপরোয়া প্রকাশ মাত্র। আগের সরকার বহাল থাকলে ইসকন প্রভৃতি গোষ্ঠীগুলো হয়তো সামনে আসত না; তলে তলে কাজ করত। কিন্তু হঠাৎ পর্দা সরে যাওয়ায় তাদের ইসলাম ও মুসলিমবিদ্বেষ জাহির হয়ে গেছে। সাথে পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রের ইন্ধন তো আছেই। তাই বিষয়টিকে এতটা সরল না ভেবে একে গুরুত্ব দেওয়া উচিত। তারচেয়ে অধিক গুরুত্বসহকারে এটি ভাবা উচিত, মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এই বাংলাদেশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে জেঁকে বসা ইসলামবিদ্বেষকে কীভাবে দূর করা যায়। সে আলোচনার পূর্বে মুসলিম রাষ্ট্রে ইসলামবিদ্বেষ নিয়ে কিছুটা আলোকপাত করা প্রয়োজন।

দুই. তুর্কির উদাহরণ

মুসলিম রাষ্ট্রগুলোতে কয়েক ধরণের ইসলামবিদ্বেষ লক্ষ্য করা যায়। পশ্চিমা চিন্তাদাস সেক্যুলার এলিটদের মধ্যে এক

ধরনের নরম ইসলামবিদ্বেষ থাকে, যা প্রায় প্রতিটি মুসলিম রাষ্ট্রেই কমবেশি দেখা যায়। আবার কখনো মুসলিম রাষ্ট্রগুলোতে রাষ্ট্র ও সরকারের পক্ষ থেকে সিস্টেমেটিক 'ডি-ইসলামাইজেশন' দেখা যায়। অধ্যাপক হাতিম বাযিয়ান এটিকে Islamophobia in Muslim States বলে আখ্যায়িত করেছেন। তবে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সবচেয়ে নগ্ন ও ভয়াবহ ইসলামবিদ্বেষের উদাহরণ দেখা গিয়েছিল কামাল আতাতুর্কের সময়কার তুর্কিতে। সেক্যুলারিজমের নামে কামাল তুর্কিতে যা করেছিলেন, তার উদাহরণ অন্য কোনো মুসলিম রাষ্ট্রে খুঁজে পাওয়া যাবে না। রাষ্ট্র ও রাজনীতিকে ইসলামের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করিয়েই তিনি থামেননি; মসজিদ, মাদরাসা, দাড়ি, টুপি, হিজাব, আযানসহ ইসলামের কোনো নিদর্শন বহাল রাখতে দেননি কামাল। লেখক সালমান সায়্যিদ কামালের সেক্যুলারিজমকে Kemalism বলে আখ্যায়িত করেছেন। কিন্তু সেই কামালিজমের করালগ্রাস থেকে আজকের তুর্কি অনেকটাই মুক্ত।

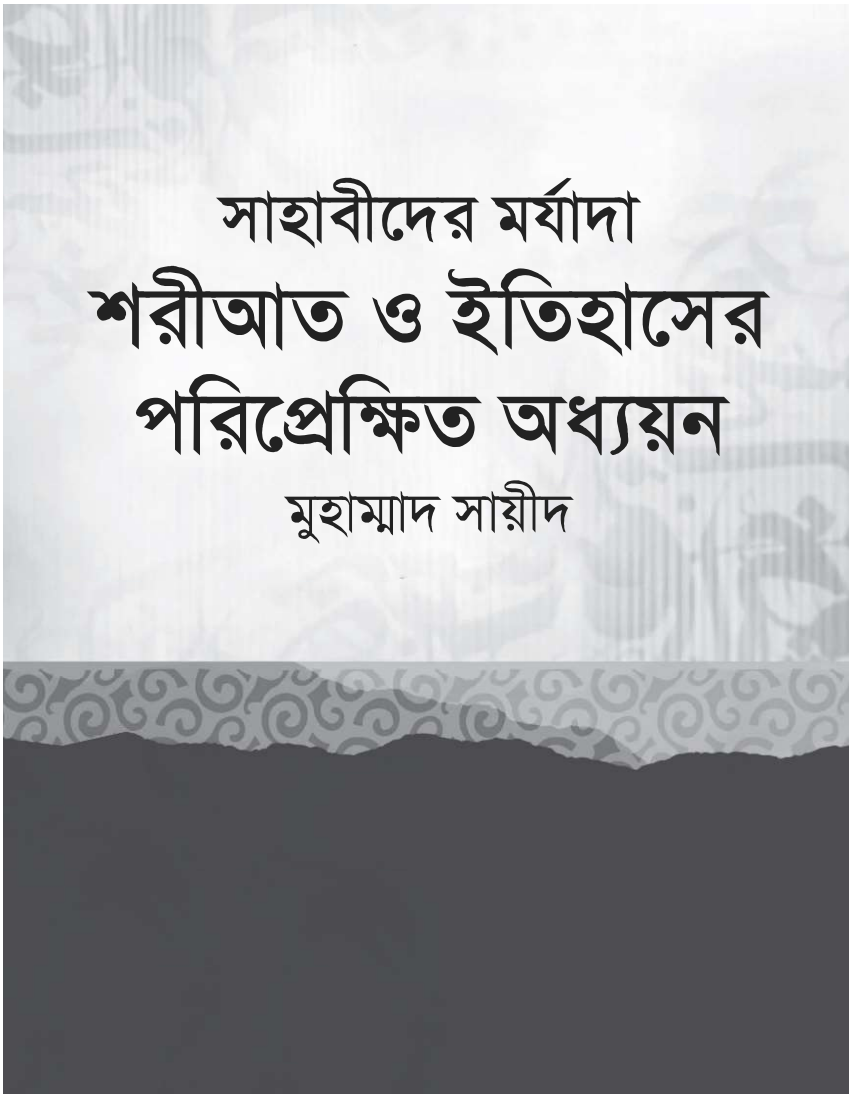
কামাল যখন ইসলামকে প্রায় নিষিদ্ধ করে রেখেছিলেন, তখন কাদিরিয়া, নকশবন্দিয়া, তিজানিয়া প্রমুখ তরীকার পীর-মাশাইখ গোপনে; কখনো মাটির নিচে গর্ত খুঁড়ে মানুষকে দ্বীন শিক্ষা দিতেন। একদিকে যখন কামাল পাশার ইসলাম-খেদাও কর্মসূচি চলছিল, আরেকদিকে ইসলামের 'সন্তানরা' ঠিকই ইসলামের পতাকা ধরে মাটি আঁকড়ে পড়ে রয়েছিলেন। বলা হয়, কামাল-পরবর্তী তুর্কিবাসী ইসলামের নাম মনে রেখেছে যে মানুষটির মাধ্যমে, তিনি বদিউজ্জামান সাঈদ নুরসী (র.)। তিনি পাহাড় থেকে পাহাড়ে ইসলাম সাথে নিয়ে বয়ে বেড়িয়েছেন। তাঁর লেখা তাফসীর 'রিসালায়ে নূর' তাঁর শিষ্যরা হাতে হাতে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন ইজমির থেকে গাজিয়েনতেপ, ইস্তাম্বুল থেকে কায়সারী পর্যন্ত। গ্রামের পাহাড়ে বসে লেখা বই নাড়িয়ে দিয়েছিল আঙ্কারার মসনদ। সাঈদ নুরসী (র.) থেকে শুরু হয়ে ২০২২ সালে ইন্তিকাল করা তুর্কির রুহানী প্রাণপুরুষ মাহমুদ এফেন্দী (র.) পর্যন্ত বিস্তৃত সূফী-মাশাইখের এমন এক তালিকা ছিল— তুর্কিতে আল্লাহর দ্বীনের জন্য যাদের খানেকাহগুলো এক-একটি ইস্পাত-দৃঢ় দুর্গের চেয়ে কম ছিল না। তাঁদের তালীম-তারবিয়াত, সমকালীন ফিতনা সম্পর্কে সচেতনতা, ইসলাহী কার্যক্রম, সাহিত্য রচনা ও শত কুরবানীর ফলে তুর্কিতে কামালিজম শক্তি হারিয়েছিল। এসব মহান সূফী-মাশাইখের পরিশ্রমের ফল হিসেবে সামনে এসেছিলেন আধুনিক তুর্কির প্রথম ইসলামপন্থি নেতা অধ্যাপক নাজমুদ্দীন এরবাকান। ১৯৭০'র দশকে তিনি মিল্লী গুরুশ বা ন্যাশনাল ভিশন আন্দোলন শুরু করেছিলেন। সেটিই ছিল আধুনিক তুর্কির প্রথম ইসলামপন্থি রাজনৈতিক আন্দোলন। এরবাকান প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হয়েও বেশিদিন সরকার চালাতে পারেননি। মাত্র ৮ মাসের মাথায় ক্যু করে তাঁকে উৎখাত করা হয়েছিল। কিন্তু নাজমুদ্দীন এরবাকান তাঁর উত্তরসূরি রজব তৈয়ব এরদোয়ান ও আবদুল্লাহ গুল প্রমুখ নেতার জন্য, বা আরও মোটাদাগে বললে বিশ্ব মুসলিম উম্মাহর জন্য এক দিকপাল হয়ে আছেন।

বাংলাদেশে কামালিজমের পর্যায়ের ইসলামবিদ্বেষ কখনও আসেনি। কিন্তু সিস্টেমের গহীনে একপ্রকার ইসলামবিদ্বেষ এখনও খোশ তবিয়তে টিকে আছে, যা ভবিষ্যতে ক্ষতিকর হতে পারে। সিস্টেমের তলে গুপ্ত ইসলামবিদ্বেষকে পরিষ্কার করতে আমাদের উলামা-মাশাইখকে বদিউজ্জামান সাঈদ নুরসী, মাহমুদ এফেন্দী হতে হবে।

তিন. কারা করবেন, কী করবেন

আমি তুর্কির উদাহরণ টেনে বলছি, ওখানে যেরকম আহলে খানেকাহ তথা সূফী-উলামা-মাশাইখ সেক্যুলারিজম, বি-ইসলামীকরণ ও ইসলামবিদ্বেষ থেকে জাতিকে রক্ষা করার জন্য এগিয়ে এসেছিলেন, এখানেও আহলে খানেকাহকে এই দায়িত্ব আঞ্জাম দিতে হবে। অন্য কেউ করলে যতটা না সাফল্য পাবে, তারচেয়ে বেশি সাফল্যের সম্ভাবনা রয়েছে সূফী-উলামা-মাশাইখের। কারণ সূফী-আউলিয়াদের অবদান মিশে আছে এ অঞ্চলের মাটিতে-পানিতে। ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামের প্রচার-প্রসারে সবচেয়ে বড় ভূমিকা তাঁদেরই। তাই উপমহাদেশে সবচেয়ে শক্তিধর দ্বীনি-সামাজিক প্রতিষ্ঠান হচ্ছে খানেকাহ। এখানে এক-একটি খানেকাহ কত-শতটি মসজিদ-মাদরাসা তৈয়ার করেছে, কত-শতমুখী দাওয়াতী কার্যক্রম চালিয়েছে, কত-সহস্র মানুষের ঈমান, আমল, আখলাক ও মনস্তাত্ত্বিক শুদ্ধির ওয়াসিলা হয়েছে, সে হিসেব খুঁজে বের করা দুষ্কর। ভারতীয় উপমহাদেশে সুন্নী ধারার কোন ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান; কোন ইসলামী আন্দোলন ছিল বা আছে, যার সুতো ইমাম শাহ ওয়ালিউল্লাহ'র দিল্লীর খানেকাহ'র সাথে গাঁথা নয়? তাই এই স্বপ্ন দেখা অবাস্তব নয় যে, আল্লাহ এসব খানেকাহ থেকে পরবর্তী সাঈদ নুরসী ও মাহমুদ এফেন্দীদের উঠাবেন, যেভাবে একদা খানেকাহ থেকে উঠিয়েছিলেন মহাবীর সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ুবী, বালাকোটের সায়্যিদ আহমদ শহীদ, দাগেস্থানের ইমাম শামিল, আলজেরিয়ার আমীর আবদুল কাদির, লিবিয়ার ওমর আল মুখতার (র.) প্রমুখকে। স্বপ্ন দেখি, আগামীতে খানেকাহ থেকে তালীমপ্রাপ্ত বিদ্যান ও সংস্কারকদের হাতেই এ দেশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে লুকায়িত ইসলামবিদ্বেষের বীজ ধ্বংস হবে। এমন উপমা নিকট অতীতে দেখা গেছে, নিকট ভবিষ্যতেও দেখা যাবে, ইনশা আল্লাহ। এমন নয় যে, আহলে খানেকাহ ছাড়া আর কেউ এ কাজ করতে পারবে না। কিন্তু আহলে খানেকাহ তথা পীর-আউলিয়া মানুষের কাছে যেরকম গ্রহণযোগ্য, সেরকম গ্রহণযোগ্যতা অন্য কারও ভাগ্যে জুটেনি।

সমাজ ও রাষ্ট্রে সুপ্ত ইসলামবিদ্বেষ দূর করে সামাজিক-রাজনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক সংস্কারে উলামা-মাশাইখকে সরল কিন্তু দূরদর্শী কিছু কর্মপরিকল্পনা হাতে নিতে হবে। প্রথমত, দ্বীনের বুনিয়াদী শিক্ষাদান ও ইসলাহী কার্যক্রমের পাশাপাশি যুগের জিজ্ঞাসাকে গুরুত্বসহকারে বুঝতে ও বুঝাতে হবে। এর কোনোটিই বাদ দেওয়ার মতো নয়। ইসলাহী কার্যক্রম বৃহত্তর সমাজ সংস্কারে প্রভাব ফেলে। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ মুজাদ্দিদে আলফে সানী (র.) এর কার্যক্রম। আবার যুগ জিজ্ঞাসা ও আধুনিকতার ফলে ধেয়ে আসা ফিতনাকে ঠিকমতো এড্রেস করতে পারলে তারুণ্যের মধ্যে গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়। মুসলিম তরুণ সমাজ আজ যে মানসিক পেরেশানির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, তার কারণ তারা আধুনিক যুগের চাহিদার সাথে ইসলামের প্রাসঙ্গিকতাকে মেলাতে পারছে না। উলামা-মাশাইখের দায়িত্ব হচ্ছে তাদের কাছে ইসলামের প্রাসঙ্গিকতা তুলে ধরা। দ্বিতীয়ত, একটি মডেল বুদ্ধিবৃত্তিক-সামাজিক আন্দোলনের সূচনা করতে হবে। সবাইকে একজোট হয়ে করতে হবে এমন নয়, যে যার জায়গা থেকে করলেই হবে। আবার সমমনা মাসলাকগুলো এক হয়ে একটি প্লাটফর্ম তৈরি করতে পারে। এখানে আমি বালাকোট-চেতনা উজ্জীবন পরিষদের উপমা পেশ করতে চাই। এ ধরণের আন্দোলনের লক্ষ্য থাকবে একইসাথে সহীহ আকীদা ও দ্বীনি চেতনার প্রতিনিধিত্ব করা, প্রচলিত সেক্যুলারিজম ও ইসলামবিরোধী ন্যারেটিভকে খণ্ডন করে নতুন ন্যারেটিভ তৈরি করা এবং এর আলোকে প্রচুর লিটারেচার প্রস্তুত করা। তুর্কিতে উলামা-মাশাইখ এই কাজটি খুব চমৎকারভাবে করতে পেরেছিলেন । তৃতীয়ত, নিজেদের বিশুদ্ধতা রক্ষা করে রাষ্ট্র-রাজনীতিতে প্রাসঙ্গিক ও প্রভাবশালী হতে হবে। এটিকে আমর বিল-মারুফ ও নাহী আনিল মুনকারের বৃহৎ ফ্রেইমওয়ার্কের ভেতরে বিবেচনা করা যায়। তুর্কির সূফী বুযুর্গরা রাজনীতির মাঠে না গিয়েও অসাধারণ ও অর্থপূর্ণ রাজনীতি করেছিলেন। বিপক্ষদলের উদাহরণ; তবে এ ক্ষেত্রে ভারতের আরএসএস একটি সফল উপমা। রাজনীতিতে না গিয়েও কীভাবে রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করা যায়, তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ আরএসএস। উপরিউক্ত তিনটি কাজ সময়সাপেক্ষ মনে হতে পারে। তবে ইতিহাস আমাদেরকে জানায়, অবনতি থেকে উন্নতিতে যাত্রার পথ অনেক লম্বা হয়। সংক্ষেপে কিংবা নিছক আবেগ দিয়ে কিছুই হাসিল হয় না। যদি ভবিষ্যতের বাংলাদেশকে আমরা সুন্দর ও সমৃদ্ধ দেখতে চাই, তাহলে এখন উলামা-মাশাইখকে এই সুদূরপ্রসারী পথে হাঁটার জন্য প্রস্তুত হতে হবে। নয়তো ইসকনের মতো গোষ্ঠীগুলো রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে একদিন এ দেশের মুসলমানদের কান্নার কারণ হতে পারে।



আল্লাহ তাআলা বিশ্ববাসীর জন্য সর্বশেষ নবী হিসেবে হযরত মুহাম্মাদ ﷺ ও চূড়ান্ত দ্বীন হিসেবে ইসলামকে মনোনীত করেছেন। আল্লাহর মনোনীত দ্বীনকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠার জন্য রাসূল ﷺ প্রাণান্ত সংগ্রাম চালিয়েছিলেন। এই সংগ্রামে রাসূল ﷺ এর সহযোদ্ধা ছিলেন সাহাবায়ে কিরাম। তাঁরা অবিস্মরণীয় প্রাণপ্রাচুর্য নিয়ে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন এবং অপরিমেয় প্রচেষ্টা ও অভূতপূর্ব আত্মদানের মাধ্যমে রাসূলের দাওয়াহ বাস্তবায়নে কাজ করেছিলেন। দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য শারীরিক ও মানসিক নিবিষ্টতার পাশাপাশি পরবর্তীদের জন্য দ্বীন সংরক্ষণের ক্ষেত্রেও সমর্পিত চিত্ততার নযীর স্থাপন করেছিলেন সাহাবায়ে কিরাম। আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল ও আল্লাহর দ্বীনের জন্য তাঁদের যে ত্যাগ-তিতিক্ষা ও অবিমিশ্র অধ্যবসায়, এটি পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল দৃষ্টান্ত। এজন্য আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল ﷺ সাহাবায়ে কিরামকে এই উম্মতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে স্বীকৃতি প্রদান করেছেন।

সাহাবায়ে কিরাম ওহী ও দ্বীন সংরক্ষণের দায়িত্ব পালন করেছেন বিধায় তাঁদের সাথে দ্বীনের অস্তিত্বের প্রশ্ন জড়িত। তাই, তাঁদের ন্যায়পরায়ণতা ও বিশ্বাসযোগ্যতার প্রতি কোনরূপ সংশয়ের অঙ্গুলি নির্দেশ করা মূলত দ্বীনের বিশুদ্ধতাকে প্রশ্ন করা। এজন্য উম্মাহর আইম্মা-উলামায়ে কিরাম সাহাবীদের ব্যাপারে সুধারণা পোষণ করাকে নিজেদের আকীদার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তাঁরা সাহাবায়ে কিরামের সমালোচনাকে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন এবং তাঁদের ব্যাপারে অমর্যাদাকর কথা বলা ও তাঁদের বিরুদ্ধাচারণ করাকে زندقة তথা দ্বীন থেকে খারিজ হওয়া বলে চিহ্নিত করেছেন।

কুরআন, হাদীস ও ইসলামী আকাইদে সাহাবায়ে কিরামের মর্যাদা সুস্বীকৃত। তবে তাদের ব্যাপারে কিছু কিছু বর্ণনা হাদীস ও তারীখে আছে, যেগুলোকে ভ্রান্ত আকাইদী ফিরকাহ ফিতনার জ্বালানি হিসেবে গ্রহণ করে । এসবের ব্যাপারেও আমাদের অনুসরণীয় ইমামগণ সুনির্দিষ্ট মানহাজ অবলম্বন করেছেন । এই প্রবন্ধে সাহাবায়ে কিরামের মর্যাদা সংশ্লিষ্ট কুরআন, হাদীস, আকাইদ ও ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতসমূহের উপর একটি প্রাথমিক অধ্যয়ন উপস্থাপন করা হবে।

এক.

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে রাসূলে পাক ﷺ এর সাহাবীগণের পরিচয়ের বর্ণনা দিয়েছেন, তাদের প্রশংসা করেছেন এবং তাদের প্রচেষ্টার সুনিশ্চিত পুরস্কারের ঘোষণা প্রদান করেছেন। সাহাবীগণের পরিচয় বর্ণনায় আল্লাহ তাআলা বলেছেন-

مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ۚ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ۖ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا ۖ سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ.

-মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল এবং তাঁর সহচরগণ কাফিরদের প্রতি কঠোর, নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল। আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় আপনি তাদেরকে রুকু ও সিজদারত দেখবেন। তাদের মুখমণ্ডলে রয়েছে সিজদার চিহ্ন। (সূরা ফাতহ, আয়াত-২৯)

দ্বীনের জন্য ত্যাগের ফলশ্রুতিতে সাহাবীদের সফলতা অর্জনের জানান দিয়ে আল্লাহ বলেছেন-

الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ اللَّهِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ.

-যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং আল্লাহর রাহে নিজেদের জান ও মাল দিয়ে জিহাদ করেছে, আল্লাহর কাছে তাদের বিরাট মর্যাদা রয়েছে আর তারাই সফলকাম। (সূরা তাওবাহ, আয়াত-২০)

আল্লাহ কুরআনের অন্যত্র বলেছেন-

مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا.

-মুমিনদের মধ্যে কতক আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা পূর্ণ করেছে। তাদের কেউ কেউ মৃত্যুবরণ করেছে এবং কেউ কেউ প্রতীক্ষা করছে। তারা তাদের সংকল্প মোটেই পরিবর্তন করেনি। (সূরা আহযাব, আয়াত-২৩)

আল্লাহ তাআলা সাহাবীদের প্রতি সন্তুষ্টির

জানান দিয়ে বলেছেন-

لَّقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا.

-আল্লাহ মুমিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন, যখন তারা বৃক্ষের নিচে আপনার কাছে শপথ করল। আল্লাহ অবগত ছিলেন যা তাদের অন্তরে ছিল। অতঃপর তিনি তাদের প্রতি প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং তাদেরকে আসন্ন বিজয় উপহার দিলেন। (সূরা ফাতহ, আয়াত-১৮)

অন্য আয়াতে আল্লাহ আরো বলেছেন-

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ.

-আর যারা হিজরতকারী ও আনসারদের মাঝে অগ্রবর্তী, এবং যারা তাদের অনুসরণ করেছে, আল্লাহ সে সমস্ত লোকদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। আর তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন জান্নাতসমূহ, যেগুলোর তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত ঝর্ণাসমূহ। সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। এটাই হল মহা সফলতা। (সূরা তাওবাহ, আয়াত-১০০)

সাহাবীগণকে অগ্রবর্তী ও নৈকট্যপ্রাপ্ত হিসেবে উল্লেখ করে আল্লাহ বলেছেন-

وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ. أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ. فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ

-অগ্রবর্তীগণ তো অগ্রবর্তীই। তারাই নৈকট্যশীল নিআমতের উদ্যানসমূহে অবস্থান করবে। (সূরা ওয়াকিয়াহ, আয়াত: ১০-১২)

উল্লিখিত আয়াতগুলো ছাড়াও কুরআন মাজীদে সাহাবীদের প্রশংসা ও মর্যাদা সংক্রান্ত আরো অনেক আয়াত রয়েছে।

দুই.

নবী করীম ﷺ এর কাছ থেকে সাহাবীগণের মর্যাদা নির্দেশক বহু হাদীস এসেছে। এসব হাদীসের বর্ণনা পাঠে সাহাবায়ে কিরামের অতুলনীয় ফদীলত মধ্যাহ্নের সূর্যালোকের ন্যায় পরিদৃষ্ট হয়। রাসূল (সা.) বলেছেন-

إِنَّ اللَّهَ اخْتَارَ أَصْحَابِي عَلَى الْعَالَمِينَ سِوَى النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ

-আল্লাহ তাআলা আমার সাহাবীগণকে নবী-রাসূল ব্যতীত সমগ্র মানব ও জিন জাতির ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। (মাজমাউয যাওয়াইদ, হাদীস-১৬৩৮৩)

সাহাবীগণ আল্লাহ কর্তৃক মনোনীত উল্লেখ করে নবী পাক ﷺ বলেছেন-

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ اخْتَارَنِي وَاخْتَارَ لِي أَصْحَابًا، فَجَعَلَ لِي مِنْهُمْ وُزَرَاءَ وَأَنْصَارًا وَأَصْهَارًا، فَمَنْ سَبَّهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا صَرْفًا وَلَا عَدْلًا

-আল্লাহ তাআলা আমাকে নির্বাচন করেছেন এবং আমার জন্য সাহাবীদের নির্বাচন করেছেন। এরপর এসব সাহাবীদের মধ্য থেকে কাউকে আমার পরামর্শক, সাহায্যকারী ও আত্মীয় বানিয়েছেন। সুতরাং যে তাদেরকে গালি দিবে, তার উপর আল্লাহর লানত এবং ফেরেশতা ও সকল মানুষের লানত। কিয়ামতের দিন এদের কোন ফরয ও নফল আমল গ্রহণ করা হবে না। (আল মুসতাদরাক আলাস সহীহাইন, হাদীস-৬৭২০)

রাসূল ﷺ বলেছেন-

لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ

-তোমরা আমার সহাবীগণকে গালমন্দ কর না। তোমাদের কেউ যদি উহুদ পর্বত পরিমাণ সোনা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় কর, তবুও তাদের এক মুদ বা অর্ধ মুদ-এর সমপরিমাণ সাওয়াব হবে না। (সহীহ বুখারী, হাদীস- ৩৬৭৩)

ইবন উমর (রা.) এর ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে-

كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ لاَ تَسُبُّوا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ . صلى الله عليه وسلم . فَلَمَقَامُ أَحَدِهِمْ سَاعَةً خَيْرٌ مِنْ عَمَلِ أَحَدِكُمْ عُمْرَهُ

-ইবন উমর (রা.) বলতেন, তোমরা মুহাম্মাদ ﷺ এর সাহাবীদের গালি দিও না। অবশ্যই তাদের কারো এক মুহূর্তের সৎকাজ তোমাদের কারো সারা জীবনের সৎকাজের চেয়েও উত্তম। (ইবন মাজাহ, হাদীস- ১৬২)

এগুলো ছাড়াও সাহাবীদের মর্যাদার ব্যাপারে রাসূল ﷺ থেকে আরো বহু হাদীস এসেছে। যেমন- خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي -আমার যুগের লোকেরা অর্থাৎ সাহাবীরা মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম। (সহীহ বুখারী) فِي أَصْحَابِي كُلِّهِمْ خَيْرٌ -আমার সাহাবীদের প্রত্যেকের মধ্যে কল্যাণ রয়েছে। (মুসনাদে বাযযার) لا تَزالونَ بخَيرٍ ما دامَ فيكُم مَن رآني وصاحَبَني -আমাকে দেখেছে ও আমার সুহবত পেয়েছে, এমন লোক যতদিন তোমাদের মধ্যে বাকি থাকবে, ততদিন তোমরা কল্যাণের সাথে থাকবে । (তাবারানী), ইত্যাদি।

তিন.

আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের ইমামগণ তাদের আকীদা বিষয়ক গ্রন্থসমূহে সাহাবায়ে কিরামের ব্যাপারে ভালো আলোচনা করা, তাঁদেরকে ভালোবাসা ও তাঁদের ব্যাপারে মন্দ ধারণা পরিহার করার প্রতি জোরারোপ করেছেন । সাহাবীদেরকে ঘৃণা করা ও তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করাকে তারা কুফরী ও নিফাকী বলে উল্লেখ করেছেন। নিম্নে কিছু আকীদা গ্রন্থের ভাষ্য উদ্ধৃত হলো।

ইমাম আযম আবূ হানীফা (র.) বলেন- আমরা সাহাবীদের কারো ভালো ছাড়া অন্য কোন কিছু আলোচনা করি না।[১] (আল ফিকহুল আকবার)

ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর الفقه الأبسط গ্রন্থে এসেছে- রাসূল ﷺ এর সাহাবীদের কারো থেকে তুমি বিমুখ হবে না এবং কোন একজন সাহাবীকে বাদ দিয়ে অন্য একজন সাহাবীর পক্ষ নিবে না। (আল ফিকহুল আবসাত)[২]

ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (র.) বলেছেন- সাহাবীদের শেষ স্তরের একজনও তাঁদের পরবর্তী যুগের লোকেদের চেয়ে উত্তম, এমনকি পরবর্তী যুগের লোকেরা যদি তাদের যাবতীয় আমল নিয়ে আল্লাহর সাক্ষাতে যেতে সক্ষম হয় তবুও। (শরহু উসূলি ইতিকাদি আহলিস সুন্নাহ)[৩]

বিশ্বময় গৃহীত ও নির্ভরযোগ্য আকীদাগ্রন্থ 'আল আকীদা আত তাহাবিয়্যাহ'তে ইমাম তাহাবী র. (২৩৮-৩২১ হি.) বলেন- আমরা রাসূল ﷺ এর সাহাবীদেরকে মহব্বত করি। তাঁদের কারো মহব্বতের ব্যাপারে আমরা বাড়াবাড়ি করি না। আবার কারো বিরুদ্ধে অসন্তুষ্টিও প্রকাশ করি না । যারা তাদেরকে ঘৃণা করে ও তাঁদের ব্যাপারে মন্দ আলোচনা করে, আমরা তাদেরকে ঘৃণা করি । আমরা তাঁদের কেবল ভালো বিষয়ের আলোচনা করি। সাহাবীদেরকে মহব্বত করা দ্বীন, ঈমান এবং ইহসানের অংশ। তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ হলো কুফরী-নিফাক এবং অবাধ্যতা। (আল আকীদা আত তাহাবিয়্যাহ)[৪]

ইমাম হিবাতুল্লাহ লালকাঈ (র.) বলেন- সাহাবীদের ব্যাপারে যে উত্তম কথা বলবে, সে নিফাকী থেকে নিরাপদ থাকবে। (শরহু উসূলি ইতিকাদি আহলিস সুন্নাহ)[৫]

চার.

মুসলিম উম্মাহর কাছে সাহাবায়ে কিরামের অনুপম মর্যাদার অন্যতম একটি কারণ হলো- আল্লাহর নির্বাচিত দ্বীনকে বিশ্ববাসীর নিকট পৌছাঁনোর ক্ষেত্রে মাধ্যমের ভূমিকায় ছিলেন তাঁরা। তাঁদের সততা ও ন্যায়পরায়ণতা নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করা বা সন্দেহ করা মূলত দ্বীনের প্রামাণ্যকে ভেদ্য করে দেওয়ার নামান্তর। একারণে তাঁদের ন্যায়পরায়ণতার ব্যাপারে এই উম্মাহর إجماع (ইজমা) হয়েছে, এবং উম্মাহর ইমামগণ কর্তৃক তাঁদের সততা ও বিশ্বস্ততা প্রশ্নাতীত বলে ঘোষিত হয়েছে। এমনকি যারা সাহাবীদের অমর্যাদা করবে এবং তাঁদের দোষ তালাশ করবে, তারা দ্বীন থেকে বের হয়ে যাবে- এতেও উলামায়ে কিরাম ঐকমত্য পোষণ করেছেন। এ প্রসঙ্গে হাদীসের মূলনীতি শাস্ত্রের প্রখ্যাত ইমাম ইবন সালাহ (র.) বলেছেন- সকল সাহাবীর আদালত তথা ন্যায়পরায়ণতার ব্যাপারে উম্মাহর ইজমা হয়েছে। সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে যাদের সাথে ফিতনা জড়িয়েছিল, তাঁদের ব্যাপারে সুধারণা ও কৃতিত্বের স্বীকৃতি স্বরূপ তাঁদের

ন্যায়পরায়ণতার ব্যাপারেও উম্মাহর ইজমা অনুরূপ। সাহাবীরা এই শরীআতের সংরক্ষক হওয়ায়, তাঁদের ব্যাপারে এই ইজমা যেন আল্লাহ তাআলাই সম্ভব করে দিয়েছেন। (মুকাদ্দিমাহ ইবনি সালাহ)[৬]

ইমাম খতীব বাগদাদী (র.) বলেন- যখন দেখবে কোন লোক সাহাবীদের যেকোনো একজনকে অসম্মান করছে, জেনে রেখো সে যিন্দিক তথা বেদ্বীন। কেননা, আমাদের নিকট রাসূল ﷺ সত্য, কুরআন সত্য। আর এই কুরআন এবং সুন্নাহ আমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন রাসূলের সাহাবীগণ। এসব লোক কুরআন ও সুন্নাহকে বাতিল করে ফেলার উদ্দেশ্যে কুরআন হাদীসের মূল সাক্ষী সাহাবীদেরকে দোষারোপ করে। সুতরাং এদেরকে আঘাত করা দরকার, এরা দ্বীন থেকে খারিজ। (আল কিফায়াহ ফী ইলমির রিওয়ায়াহ)[৭]

ইমাম শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (র.) বলেছেন- সাহাবীরা দ্বীনের জ্ঞানের উৎস তথা مأثور ও منقول বর্ণনার মাধ্যম। মাধ্যমকে দোষারোপ করা মূলত এই মাধ্যমসূত্রে প্রাপ্ত বিষয়কেই দোষারোপ করা, বর্ণনাকারীকে অবজ্ঞা করা মূলত বর্ণিত বিষয়কে অবজ্ঞা করার নামান্তর। যিনি এ বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করেন এবং আকীদার ক্ষেত্রে যিন্দিক ও নাস্তিক হওয়া থেকে বেঁচে থাকেন, তাঁর কাছে এটি স্পষ্ট। (কিতাবুল কাবাইর, ইমাম শামসুদ্দীন আয যাহাবী)[৮]

ইমাম নববী র. (৬৩১-৬৭৬ হি.) বলেন- সাহাবীরা সকলেই ন্যায়পরায়ণ। যে সকল সাহাবীদের সাথে ফিতনা জড়িয়ে পড়েছিল, তাঁরাও। এ বিষয়ে যাদের মতামত গ্রহণযোগ্য তাঁদের সকলেরই ইজমা রয়েছে। (আত তাকরীবু ওয়াত তাইসীর)[৯]

ইমাম ইবন হাজার আল হাইতামী র. (৯০৯-৯৭৪ হি.) বলেন- সাহাবীদের দৃঢ় প্রচেষ্টা না থাকলে আমাদের কাছে কুরআন-সুন্নাহ পৌঁছাতো না, أصل কিংবা فرع কিছুই পৌঁছাতো না। অতএব যারা সাহাবীদেরকে দোষারোপ করবে, সে এই মিল্লাত থেকে বের হয়ে যাবে। কারণ সাহাবীদের দোষারোপ করলে দ্বীন বিলুপ্ত হয়ে পড়ে। (আয যাওয়াজির আন ইকতিরাফিল কাবাইর)[১০]

আমাদের ইমামগণ সাহাবীদের বিরোধিতাকে দ্বীন থেকে খারিজ হওয়া বলে উল্লেখ করেছেন। প্রকৃত অর্থেই, সাহাবীদের বিরোধিতার সাথে বেদ্বীন হওয়ার ঐতিহাসিক যোগসূত্র রয়েছে। সাহাবীদের সময়ে দ্বীনের বিরোধিতার উদ্দেশ্যে মুনাফিক ও যিন্দিকদের মাধ্যমে সাহাবায়ে কিরামের বিরোধিতা ও তাদের বিপক্ষে বিদ্বেষ ছড়ানোর সূত্রপাত হয়েছিল। ছদ্মবেশী ইয়াহুদী আব্দুল্লাহ বিন সাবা সর্বপ্রথম প্রকাশ্যে সাহাবীদের বিরোধিতায় মেতে ওঠে এবং তাদেরকে দোষারোপ করে। এরপর এই ধারা উমাইয়া ও আব্বাসী শাসনামলে অব্যাহত থাকে । সাহাবীদের বিরোধিতার ধারা আব্বাসী শাসনামলে ইবরাহীম ইবন সাইয়ার আন নাযযামের মাধ্যমে বেগবান হয়েছে। সে ব্যাপকভাবে সাহাবীদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটানোতে প্রবৃত্ত হয়েছে ও অপবাদ আরোপ করেছে। হাদীস বর্ণনাকারী বিভিন্ন সাহাবীদের গ্রহণযোগ্যতা ও বিশ্বস্ততার ব্যাপারেও নাযযাম প্রশ্ন উত্থাপন করেছে। প্রখ্যাত মনীষী ইবন কুতাইবা র. (২১৩-২৭৬ হি.) সহ আরো অনেকে নাযযামকে বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে প্রতিহত করেছেন। শিআ লেখকদের তরফ থেকেও সাহাবী বিরোধী বর্ণনা ও ইতিহাস ছড়ানো হয়েছে। শরীফ রিদা নামীয় লেখক হযরত আলী (রা.) এর কথামালা সংকলন করেছেন نهج البلاغة নামে। এ গ্রন্থে সাহাবীদের বিরুদ্ধে সনদবিহীন প্রচুর মিথ্যা কথা সংকলন করা হয়েছে। ইমাম যাহাবী (র.), খতীব বাগদাদী (র.) সহ আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের ইমামগণ নানাবিধ পর্যালোচনাপূর্বক এটিকে জাল গ্রন্থ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। সাহাবীদের বিরুদ্ধে আনীত কোন অভিযোগ ও মিথ্যাচারকে আমাদের পণ্ডিতবর্গ অপ্রতিহত রাখেননি। সাহাবীদের সমালোচনা ও ছিদ্রান্বেষণে বিভিন্ন সময় রাসূল ﷺ এর কিছু হাদীসের অপব্যাখ্যা ও ইতিহাসের মিথ্যা উৎসাবলির উপর নির্ভর করা হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে সাহাবীদের ব্যাপারে আপত্তিকর কথাবার্তা সম্বলিত গ্রন্থও রচিত হয়েছে কিংবা এতদুদ্দেশ্যে বিভিন্ন কিতাবকে জাল করা হয়েছে। ইসলামী ইতিহাস গবেষক আলী সাল্লাবী তার التحذير من بعض الكتب التي شوهت تاريخ الصحابة নামীয় লেখায় এ ব্যাপারে সংক্ষিপ্ত ও সারবান আলোচনা করেছেন। তিনি এতে تاريخ اليعقوبي, الأغاني لأبي الفرج الإصفهاني, الإمامة والسياسة، نهج البلاغة গ্রন্থগুলোর বিভ্রান্তি, অবিশুদ্ধতা ও সাহাবীদের ব্যাপারে এগুলোতে বিদ্যমান মিথ্যাচার ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করেছেন এবং এসব গ্রন্থ ও এগুলোর লেখকদের ভ্রান্ততার ব্যাপারে রিজাল শাস্ত্রজ্ঞ ইমামগণের মতামত উল্লেখ করেছেন। সাহাবায়ে কিরামের বিশ্বাসযোগ্যতাকে অস্বীকার করে Orientalist Propaganda ও কম হয়নি। Ignaz Goldziher, Joseph Schacht, Arthur Jeffrey সহ অনেক প্রাচ্যতাত্ত্বিক সাহাবীদের বিশ্বাসযোগ্যতাকে অস্বীকার করেছেন এবং তাদের দিকে সন্দেহের তির তাক করেছেন। তাদেরও আপত্তি খণ্ডনে মুসলিম পণ্ডিতগণ বুদ্ধিবৃত্তিক তৎপরতা প্রদর্শন করেছেন। অধুনা হাসান আল মালিকী কর্তৃক লিখিত الصحابةُ بين قراءةٌ في كتب العقائد و الصُّحبة اللُّغوية والصُّحبة الشَّرعية গ্রন্থদ্বয়ে সাহাবীদেরকে আপত্তিকর সংজ্ঞার মাধ্যমে বিভাজিত করে তাঁদের বিরাট সংখ্যককে প্রশ্নবিদ্ধ করা হয়েছে, খেলো করা হয়েছে এবং অনায্য সমালোচনার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করা হয়েছে। তবে উলামায়ে কিরাম এসব মিথ্যাচারের অপনোদন করেছেন।

ভারতীয় উপমহাদেশের মশহুর লেখক ও চিন্তক মরহুম সায়্যিদ আবুল আলা মওদুদী (১৯০৩-১৯৭৯ খ্রি.) তার বিভিন্ন গ্রন্থে সাহাবায়ে কিরামের সমালোচনা করেছেন এবং তাঁদের দোষান্বেষণ করেছেন। তার বুদ্ধিবৃত্তি উম্মাহর ইলমী ঐতিহ্যের সাথে নানাবিধ দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েছিলো। এর ফলস্বরূপ তার থেকে বারবার যেসব চৈন্তিক বিভ্রমের উৎপাদন হয়েছে এরই একটি হলো সাহাবীদের ব্যাপারে অশোভন মন্তব্য। তিনি তার লেখায় সাহাবীদের ব্যাপারে বহুরকম অসম্মানজনক কথাবার্তার কারণে উপমহাদেশে আযমতে সাহাবার মুখালিফ বলে চিহ্নিত হয়েছেন। তার নিম্নোদ্ধৃত বক্তব্য থেকে তার অবস্থান অনুমেয়। তিনি বলেছেন- যে সমাজে সুদ প্রচলিত আছে সেখানে দুই ধরণের চারিত্রিক বিপর্যয় দেখা দেয়। সুদ গ্রহণকারীর মধ্যে লোভ-লালসা, কৃপণতা, স্বার্থপরতা এবং সুদ প্রদানকারীর মধ্যে ঘৃণা ও হিংসা তৈরি হয়। উহুদের বিপর্যয়ে এ দুই প্রকারের রোগের কিছু না কিছু অংশ ছিল । (তাফহীমুল কুরআন, প্রথম খন্ড, পৃ.- ২৮৮)

প্রকৃতপক্ষে মরহুম সায়্যিদ আবুল আলা মওদুদীর লেখায় সাহাবীদের শানের ক্ষেত্রে অসমীচীন– এমন মন্তব্যের উদাহরণ প্রচুর। এমনকি এও মিথ্যা নয় যে, তিনি তাঁর নিজস্ব চিন্তার মানদণ্ডে সাহাবীদের আদালতকে পরখ করতে তৎপর হয়েছেন। হাদীসের বিষয়বস্তু মনঃপূত না হওয়ায় তিনি হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীকে দোষারোপ করেছেন। হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত বুখারী শরীফের হাদীস- রাসূল ﷺ কে ত্রিশজন লোকের শক্তি দেওয়া হয়েছে। এই হাদীসের নির্ভরযোগ্যতাকে সন্দেহ করে 'তাফহিমাত' গ্রন্থের ১ম খণ্ডে তিনি একে মহাজনের প্রতি অধীনস্থের বাগাড়ম্বর প্রশংসা বলে অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছেন এবং মহাজনের ব্যক্তিত্বের প্রতি গুণমুগ্ধ হওয়ার দরুন এমন বর্ণনাকারীর বর্ণনা অগ্রহণযোগ্য বলেও রায় দিয়েছেন। এই বক্তব্যে মরহুম মওদুদী কর্তৃক 'হাদীস অস্বীকার' এবং সাহাবীদের আযমতের বিরোধিতার নমুনা অত্যন্ত স্পষ্ট। আশার কথা হলো, সাহাবায়ে কিরামের আযমত সংরক্ষণের অংশ হিসেবে আরব-আযমের উলামায়ে কিরাম তার সাহাবী-বিরোধী মন্তব্যের যথাযোগ্য প্রত্যুত্তর দিয়েছেন। মাওলানা মনযুর নোমানী, ইউসুফ বানূরী, হাকিম মুহাম্মদ আখতার, যাকারিয়া কান্ধলভী, আযীযুর রহমান নেছারাবাদীসহ উপমহাদেশের বিরাটসংখ্যক আলিম মরহুম মওদুদীর এসব কথা ও চিন্তাকে ফিতনা হিসেবে শনাক্ত করে এসবের জবাব দিয়েছেন। আরবের উলামায়ে কিরামও সাহাবীদের ব্যাপারে মরহুম

মওদুদীর লাগামহীন কথাবার্তার নিন্দা করেছেন। যশস্বী আলিম ইউসুফ আল কারযাবী (১৯২৬-২০২২ খ্রি.) বলেছেন- ইসলামের ইতিহাস বিষয়ে আল্লামা মওদুদীর মতামতে এমন কিছু পয়েন্ট রয়েছে, যেগুলোর ব্যাপারে ভারত-পাকিস্তানের আলিমগণ তীব্র সমালোচনা করেছেন। সাহাবায়ে কিরামের কয়েকজনকে নিয়ে মওদুদী এমন কিছু সমালোচনা করেছেন, রাসূল ﷺ এর সাথে সুহবত থাকার দরুন এসব সমালোচনা সাহাবীদের জন্য মোটেই মানানসই নয়। এর উদাহরণ হচ্ছে উসমান (রা.) এর ব্যাপারে তার সমালোচনা। আর মুয়াবিয়া (রা.) ও বনু উমাইয়াকে নিয়ে তার সমালোচনার কথা তো বলাই বাহুল্য। তার একাধিক গ্রন্থে এসব সমালোচনা স্থান পেয়েছে। তন্মধ্যে তিনটি গ্রন্থ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য: ১. আল খিলাফাতু ওয়াল মুলক (খিলাফত ও রাজতন্ত্র)। ২. মুজিজু তারীখি তাজদীদিদ দ্বীন ওয়া ইহইয়াইহী। ৩. আল হুকুমাতুল ইসলামিয়্যাহ। (তারীখুনাল মুফতারা আলাইহ)[১১]

মরহুম সায়্যিদ আবুল আলা মওদুদী সাহাবা, তাবিঈন ও তাবি-তাবিঈনের যুগকে 'জাহিলিয়্যাত' বলে আখ্যা দিয়েছেন। ইউসুফ আল কারযাবী মওদুদীর এসংক্রান্ত কিছু বক্তব্য উদ্ধারপূর্বক বলেছেন- লক্ষ্য করুন, এই পণ্ডিত কীভাবে রায় দিয়ে দিলেন যে ইসলাম প্রারম্ভিক কালেই সাহাবা, তাবেঈন ও তাবি-তাবিঈনের যুগ থেকে জাহিলিয়্যাতে নিপতিত হয়ে গিয়েছে! অথচ সহীহ হাদীসের বর্ণনা ও বিশুদ্ধ ইতিহাস অনুযায়ী ঐ যুগটি ছিলো এই উম্মাহর শ্রেষ্ঠ সময়। (তারীখুনাল মুফতারা আলাইহ)[১২]

মিশরীয় ইসলাম ও রাজনীতি চিন্তক সাইয়িদ কুতুব তার العدالة الاجتماعية في الإسلام গ্রন্থে সাহাবায়ে কিরাম ও ইসলামের ইতিহাস বিষয়ে অমূলক সমালোচনা করেছিলেন। ইউসুফ কারযাবীসহ অন্যান্য আলিমগণ এসবের খণ্ডনে কথা বলেছেন। হযরত উসমান (রা.) অক্ষম, ব্যর্থ ও সাহাবীদের নিকট অপছন্দনীয় ছিলেন বলে সায়্যিদ কুতুব যে মন্তব্য করেছেন, সেসবের সমালোচনায় কারযাবী বলেছেন- তিনি খুলাফায়ে রাশিদার তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান (রা.) এর সমালোচনার ক্ষেত্রে খুব কঠোরতা অবলম্বন করেছেন। অথচ উমাইয়া শাসক মারওয়ানের ব্যাপারে তেমন কোন সমালোচনা করেননি (তারীখুনাল মুফতারা আলাইহ)। সায়্যিদ কুতুব কর্তৃক সাহাবীদের এইসব সমালোচনাকে মওদুদীর প্রভাবজাত বলে উল্লেখ করেছেন ইউসুফ কারযাবী। মূলত, সায়্যিদ আবুল আলা মওদুদী ও সায়্যিদ কুতুবের সাথে বহুক্ষেত্রে ইউসুফ কারযাবীর চৈন্তিক আত্মীয়তা রয়েছে। তা সত্ত্বেও তিনি তাদের সমালোচনা করেছেন, কারণ সাহাবীদের ব্যাপারে তাদের এমন ধৃষ্টতাপূর্ণ মন্তব্য সমর্থনের কোন সুযোগ নেই।

সাহাবায়ে কিরামের সমালোচনা দুরভিসন্ধিমূলকভাবে করা হোক কিংবা অজ্ঞতা ও উদাসীনতাবশত হোক, এসবের বিরুদ্ধে উম্মাহ দরদি আলিম-স্কলারদের প্রতিরোধী ভূমিকা থাকা সাহাবীদের প্রাপ্য হক। সাহাবায়ে কিরাম হলেন ناقلو الدين (দ্বীনের বাহক)। আল্লাহর রাসূল ﷺ এর সর্বাত্মক প্রচেষ্টার মাধ্যমে গঠিত মানবসমাজ হচ্ছেন সাহাবীগণ। সুতরাং তাঁদেরকে দোষারোপ করা, পরোক্ষভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর দাওয়াতের সফলতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করার নামান্তর। ইমাম মালিক (র.) বলেন- সাহাবী বিরোধীরা প্রকৃতপক্ষে রাসূল ﷺ এর বিরুদ্ধে কুৎসা রটাতে চেয়েছিলো। কিন্তু এটি তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি বিধায় তারা সাহাবীগণের ব্যাপারে মিথ্যাচার করেছে, যাতে এটা বলা যায় যে, এই লোক খারাপ ছিলেন নচেৎ তিনি সৎ হয়ে থাকলে তার সাথিরাও সৎ হতেন। (আস সারিমুল মাসলুল)[১৩]

পাঁচ.

রাসূল ﷺ এর সাহাবীগণের সমালোচনায় সাধারণত একটি বিষয় পরিলক্ষিত হয় যে, সমালোচনার ভিত্তি হিসেবে এসব ক্ষেত্রে প্রধানত ইতিহাস, জীবনীগ্রন্থের রিওয়ায়াত কিংবা হাদীসের কিতাবের ফাদাইল-মানাকিবের উপর নির্ভর করা হয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে, মুহাদ্দিসীনে কিরাম বিষয়বস্তুর প্রকরণ বিবেচনায় রেওয়ায়াত গ্রহণের ক্ষেত্রে মূলনীতি প্রয়োগে বৈচিত্র্যের অবতারণা করে থাকেন। হাদীসের রিওয়ায়াত গ্রহণের ক্ষেত্রে হাদীসের ইমামগণ আহকাম সংক্রান্ত রিওয়ায়াতের বেলায় যে পর্যায়ের সতর্কতা ও কঠোরতা অবলম্বন করেছেন, সিয়ার, ফাদাইল-মানাকিব, মালাহিম, মাগাযী, তাফসীর ও তারীখ সংক্রান্ত রিওয়ায়াতের ক্ষেত্রে এই মূলনীতি অনুসরণ করা হয়নি। যেমন, ইবন সায়্যিদিন নাস (র.) তার عيون الأثر গ্রন্থে বলেছেন- রাকাইকের ক্ষেত্রে অধিকাংশ আহলে ইলম সহজতার নীতি অবলম্বন করেছেন। মাগাযীর ক্ষেত্রে আহকামের সম্পর্ক নেই এমন রিওয়ায়াত এবং এই ধারার অন্যান্য রিওয়ায়াতের বেলায়ও তারা সহজতা অবলম্বন করেছেন। আহকামের সম্পর্ক না থাকলে এসব ক্ষেত্রে এমন এমন বর্ণনা গ্রহণ করা হয়, যা হালাল-হারামের ক্ষেত্রে গ্রহণ করা হয় না। (উয়ূনুল আসার)[১৪]

ইমাম হালাবী র. (৯৭৫ হি. -১০৪৪ হি.) বলেছেন- সিরাতশাস্ত্রে সহীহ, সাকীম, দঈফ, বালাগ, মুরসাল, মুনকাতি ও মুদাল রিওয়ায়াতের সন্নিবেশ ঘটে, তবে মওদূ বর্ণনা বাদ পড়ে। (আস সিরাহ আল হালাবিয়্যাহ)[১৫]

তাছাড়া মাগাযী, মালাহিম ও তাফসীরের বিরাট সংখ্যক রিওয়ায়াত দুর্বল ও অযথার্থ হওয়ার ব্যাপারে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (র.) সহ অনেক মুহাদ্দিসীনে কিরাম খুব কঠোর ভাষায় মন্তব্য করেছেন। আর তারীখের ক্ষেত্রে, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ব্যতিরেকে এ বিষয়ক গ্রন্থাদির কোন বর্ণনার উপর পুরোপুরি নির্ভর করাকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। আবূ বকর ইবনুল আরাবী তার العواصم من القواصم গ্রন্থে বলেছেন- হাদীসের ইমামগণের বর্ণনা ছাড়া অন্য কারো বর্ণনা গ্রহণ করো না, ইমাম তাবারীর ইতিহাস ছাড়া অন্য কোন ঐতিহাসিকের ইতিহাস শ্রবণ করো না। (আল আওয়াসিম মিনাল কাওয়াসিম)[১৬]

দেখা যাচ্ছে, তারীখে তাবারী ইতিহাস গ্রন্থ হিসেবে নির্ভরযোগ্য বলে স্বীকৃত। অথচ খোদ ইমাম তাবারী (র.) তাঁর তারীখে কিছু কিছু রিওয়ায়াত কোন দিক বিবেচনায় সহীহ হবে না– এমন সম্ভাবনাকেও গ্রাহ্য করেছেন। তিনি বলেছেন- এই গ্রন্থের যেসব বর্ণনা পাঠক অপছন্দ করতে পারেন এই কারণে যে, কোনভাবেই তিনি এর বিশুদ্ধতা নির্ণয় করতে পারছেন না। এক্ষেত্রে তিনি যেন জেনে রাখেন, এসব বর্ণনা আমাদের পক্ষ থেকে বানিয়ে এখানে সংকলন করা হয়নি বরং বর্ণনাকারীদের মারফতেই এগুলো আমাদের কাছে পৌঁছেছে। (তারীখে তাবারী)[১৭]

ইমাম তাবারীর বক্তব্য হতে প্রতীয়মান হয়, ইতিহাসের বর্ণনা গ্রহণের ক্ষেত্রে তিনি শুদ্ধাশুদ্ধি যাচাই নয়, বরং সনদ থাকাকেই যথেষ্ট মনে করেছেন এবং সেগুলো সংকলন করেছেন। অবশ্য কেবল তারীখে তাবারী নয়, বরং ইসলামী তারিখ তথা ইতিহাসের মৌলিক উৎসগুলোর প্রায় সবকটিই মূলত বিশ্বকোষ ধরণের। এগুলোতে সবধরনের বর্ণনা সংরক্ষণ করা হয়েছে, এবং বর্ণনাগুলোর শুদ্ধাশুদ্ধি যাচাই করার দায়িত্ব গবেষক-পাঠকদের উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। 'আধুনিক যুগের ইবন খালদুন' খ্যাত ইরাকী ইতিহাস বিশ্লেষক ড. আকরাম দিয়া বলেন- আমাদের পূর্ববর্তী তারীখ রচনাকারীগণ তাদের গ্রন্থে ইতিহাসের যেসব বর্ণনা সংকলন করেছেন, সেগুলোর ক্ষেত্রে তারা হাদীস সংকলনের পদ্ধতি অনুসরণ করেননি, বরং তারা এই ক্ষেত্রে পুরোপুরি কোমলতা (তাসাহুল) অবলম্বন করেছেন। (আদ দিরাসাহ আত তারিখিয়্যাহ)[১৮]

বিশেষজ্ঞ ভাষ্য হতে প্রতীয়মান হয়, ফাদাইল-মানাকিব, সিয়ার-মাগাজী ও তারীখের রিওয়ায়াতগুলো প্রশ্নাতীত নয়, এবং এগুলোর বিশুদ্ধতা তাহকীক তথা অনুসন্ধান ও

পরীক্ষা-নিরীক্ষা সাপেক্ষ বিষয়। সুতরাং সাহাবীদের ব্যাপারে জানার জন্য, বিশেষত সাহাবীদের সময়কার ফিতনা সংক্রান্ত বিষয়ে এসব উৎসের যেকোন বর্ণনায় প্রশ্নাতীতভাবে নির্ভরশীল হওয়া অনিরাপদ। তবে সাহাবায়ে কিরামের জীবন-ইতিহাস বিষয়ে বহু স্বতন্ত্র গ্রন্থ প্রণীত হয়েছে। এগুলোর উপর কিছু কিছু তাহকীক সম্পন্ন হওয়ায় এগুলোর গ্রহণযোগ্য ও অগ্রহণযোগ্য বর্ণনাগুলো চিহ্নিত করা কিছুটা সহজ, ফলে গ্রন্থগুলো তুলনামূলক নির্ভরযোগ্য। তন্মধ্যে ক্লাসিক কিছু গ্রন্থ হলো- ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (র.) এর فضائل الصحابة (ফাদাইলুস সাহাবা), ইমাম ইবন আব্দিল বার (র.) এর الاستيعاب في معرفة الأصحاب (আল ইসতীআব), ইমাম ইবনুল আসির (র.) এর أسد الغابة في معرفة الصحابة (উসুদুল গাবাহ ফী মারিফাতিস সাহাবাহ), ইমাম ইবন হাজার আসকালানী (র.) এর الإصابة في تمييز الصحابة (আল ইসাবাহ ফী তাময়িযিস সাহাবাহ) ইত্যাদি।

সর্বোপরি, সাহাবায়ে কিরাম দ্বীনের অনুসারীদের কাছ থেকে সম্মান ও আনুগত্য পাওয়ার হকদার। তাদের সম্মান-মর্যাদার সাথে বেমানান বর্ণনার ক্ষেত্রে উলামায়ে কিরামের পক্ষ থেকে তাহকীক তো বটেই, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে تأويل (ব্যাখ্যা) করতে হবে। কোন হাদীস বা ইতিহাসের টেক্সটে সাহাবীগণের সমালোচনাযোগ্য কোন কিছু পাওয়া গেলে, এসব বর্ণনার শুদ্ধাশুদ্ধি পরীক্ষা করা এবং দরকার হলে এসবের تأويل করা আমাদের ইমামগণের অনুসৃত অভিগমন (Approach)। তারা তাদের পরবর্তীদের জন্যও এই ধারায় অনুগমনের পরামর্শ দিয়েছেন। ইমাম গাযালী র. (৪৫০-৫০৫ হি.) বলেছেন- সাহাবীদের ব্যাপারে মিথ্যা বর্ণনার অধিকাংশই রাফিজী, খারিজী ও সাহাবীদের সময়ের ফিতনা নিয়ে আলোচনায় ব্যস্ত থাকা লোকদের আবিষ্কার। এক্ষেত্রে পাঠকের উচিত হলো, যেসব বর্ণনা প্রমাণিত নয় তা এড়িয়ে যাবে এবং প্রমাণিত হলে এর تأويل বা ব্যাখ্যা করবে। تأويل করা অসম্ভব হলে বলবে এর পেছনে হয়ত কোন ব্যাখ্যা কিংবা ওযর আছে যা আমার অজানা। জেনে রেখো, এখানে তোমার অবস্থান হবে হয় তুমি কোন মুসলিমের ব্যাপারে মন্দ ধারণা করবে, তাকে দোষারোপ করবে ও মিথ্যাবাদী হবে। অথবা তুমি তার ব্যাপারে ভালো ধারণা করবে এবং দোষারোপ করা থেকে বিরত থাকবে। উদাহরণত, ধরো এটি তোমার ভুল হলো, মুসলমানের ব্যাপারে ভালো ধারণা করলে যদি এতে ভুল হয়, তাও এটি খারাপ ধারণার চেয়ে তুলনামূলক নিরাপদ। (আল ইকতিসাদ ফিল ইতিকাদ)[১৯]

ইমাম কাযী ইয়াদ র. (৪৭৬-৫৪৪ হি.) বলেছেন- রাসূলুল্লাহ ﷺ কে সম্মান ও মর্যাদা দানের অন্তর্গত বিষয়ের মধ্যে রয়েছে সাহাবীদেরকে সম্মান ও মর্যাদা দেওয়া, তাদের হকের ব্যাপারে অবগত থাকা, তাদের অনুসরণ করা ও প্রশংসা করা, তাদের জন্য ইস্তিগফার করা ও তাদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব নিয়ে মাতামাতি থেকে বিরত থাকা, ঐতিহাসিকদের বর্ণিত ইতিহাস, জাহিল রাবীদের বর্ণনা, সাহাবীদের উপর অপবাদ আরোপকারী শিআ ও বিদআতীদের ভ্রান্ততা- এসব থেকে দূরে থাকা, তাদের মধ্যকার ফিতনার ব্যাপারে বর্ণিত বিষয়গুলোর উপযুক্ত ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ ও যথাযথ কার্যকারণ খোঁজা, যেহেতু তাঁরা এর যোগ্য। (আশ শিফা বিতারীফি হুকুকিল মুস্তাফা)[২০]

শেষকথা, ইসলাম তার অনুসারীদের কাছ থেকে অপরিহার্য ভিত্তিতে ইনসাফ দাবি করে। সাহাবায়ে কিরামের পরবর্তী সময়ের সকল মুসলমান কর্তৃক সাহাবীদের ভালো বিষয় নিয়ে আলোচনা করা এবং তাদেরকে সমালোচনার বিষয় হিসেবে গ্রহণ না করা- ইনসাফ। এর ব্যত্যয় ঘটলে ইসলামী আকীদা ভাষ্যে সেটা নিফাকী ও গুমরাহী। ইমাম তাহাবী (র.) তাঁর আকীদায় লিখেছেন- যারা রাসূলে পাকের সাহাবীগণ, স্ত্রীগণ এবং সন্তান-সন্ততিগণের ব্যাপারে ভালো আলোচনা করবে তারা নিফাক থেকে মুক্ত থাকবে। পূর্ববর্তী উলামায়ে কিরামের অন্তর্ভুক্ত সাহাবা ও তাবিঈন এবং পরবর্তীতে আগত কুরআন, হাদীস, ফিকহের পারদর্শী ও গবেষকগণকে সম্মানের সাথে স্মরণ করতে হবে। আর যারা তাদেরকে মন্দভাবে স্মরণ করবে, তারা পথভ্রষ্ট। (আল আকীদা আত তাহাবিয়্যাহ)

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَنَا حَقٌّ , وَالْقُرْآنَ حَقٌّ , وَإِنَّمَا أَدَّى إِلَيْنَا هَذَا الْقُرْآنَ وَالسُّنَنَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَإِنَّمَا يُرِيدُونَ أَنْ يُجَرِّحُوا شُهُودَنَا لِيُبْطِلُوا الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ , وَالْجَرْحُ بِهِمْ أَوْلَى وَهُمْ زَنَادِقَةٌ. (الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي)

٨. أنهم أرضى الوسائل من المأثور والوسائط من المنقول، والطعن في الوسائط طعن في الأصل، والازدراء بالناقل ازدراء بالمنقول، هذا ظاهر لمن تدبره وسلم من النفاق ومن الزندقة والإلحاد في عقيدته.(كتاب الكبائر للذهبي)

٩. الصحابة كلهم عدول، من لابس الفتن وغيرهم بإجماع من يعتد به.

١٠. ولولا ذلك منهم ما وصل إلينا قرآن ولا سنة ولا أصل ولا فرع. فمن طعن فيهم فقد كاد أن يمرق من الملة لأن الطعن فيهم يؤدي إلى انطماس.

١١. ورأي العلامة المودودي في التاريخ الإسلامي من النقاط التي أثارت عليه نقمة علماء الهند وباكستان، فقد تناول فيها بعض الصحابة بما لا يليق بصحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه. دع عنك ما ذكره عن معاوية بن أبي سفيان، وبني أمية. وقد أثبت رأيه هذا في أكثر من كتاب له، ولا سيما كتبه الخلافة والملك وموجز تاريخ تجديد الدين وإحيائه والحكومة الإسلامية

١٢. فانظر كيف حكم هذا العلامة الكبير على الإسلام بالارتكاس في الجاهلية مبكرا، منذ عهد الصحابة والتابعين والأتباع، وهي خير قرون الأمة، بنصوص الأحاديث الصحيحة، وبقراءة التاريخ الصحيح

١٣. إنما هؤلاء أقوام أرادوا القدح في النبي صلى الله عليه وسلم فلم يمكنهم ذلك ، فقدحوا في أصحابه حتى يقال رجل سوء و لو كان رجلاً صالحاً لكان أصحابه صالحين

١٤. والذي ذهب إليه كثير من أهل العلم الترخص في الرقائق، وما لا حكم فيه من أخبار المغازي، وما يجري مجرى ذلك، وأنه يقبل فيها ما لا يقبل في الحلال والحرام؛ لعدم تعلق الأحكام بها.

١٥. أن السير تجمع الصحيح والسقيم والضعيف والبلاغ والمرسل والمنقطع والمعضل دون الموضوع.

١٦. لا تقبلوا رواية إلا عن أئمة الحديث، ولا تسمعوا لمؤرخ كلاما إلا للطبري

١٧. فما يكن في كتاب هذا من خبر يستنكره قارئه من أجل أنه لم يعرف له وجها في الصحة فليعلم أنه لم يؤت في ذلك من قبلنا، وإنما أتي من قبل بعض ناقليه إلينا.

١٨. أن الروايات التاريخية التي دونها أسلافنا المؤرخون لم تعامل معاملة الأحاديث ، بل تم التساهل فيها.

١٩. الاختلاق أكثره اختراعات الروافض والخوارج وأرباب الفضول الخائضين في هذه الفنون، فينبغي أن تلازم الإنكار في كل ما لم يثبت، وما ثبت فاستنبط له تأويلا، فما تعذر عليك فقل لعل له تأويلا وعذرا لم أطلع عليه. واعلم أنك في هذا المقام بين أن تسئ الظن بمسلم وتطعن عليه وتكون كاذبا، أو تحسن الظن به وتكف لسانك عن الطعن وأنت مخطئ مثلا، والخطأ في حسن الظن بالمسلم أسلم من الصواب بالطالسبيل.

٢٠. قال رحمه الله تعالى في الشفاء: ومن توقيره صلى الله عليه وسلم وبره توقير أصحابه وبرهم ومعرفة حقهم، والاقتداء بهم وحسن الثناء عليهم، والاستغفار لهم، والإمساك عما شجر بينهم، ومعاداة من عاداهم، والإضراب عن أخبار المؤرخين وجهلة الرواة وضلال الشيعة والمبتدعين القادحة في أحد منهم، وأن يلتمس لهم فيما نقل عنهم من مثل ذلك فيما كان بينهم من الفتن أحسن التأويلات والمحامل ويخرجه أصوب المخارج، إذ هم أهل ذلك.

---

١. وَلَا نَذْكر أحدا من أَصْحَاب رَسُول الله إِلَّا بِخَيْر.

٢. وَلَا نتبرأ من احد من أَصْحَاب رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَلَا توالي أحدا دون احد.

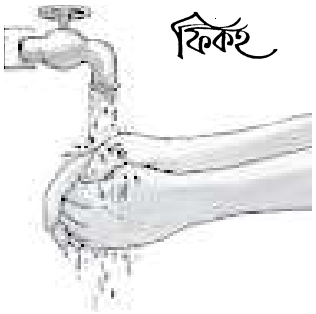
٣. فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروه ولو لقوا الله بجميع الأعمال. (شرح أصول اعتقاد أهل السنة)

٤. وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا نُفْرِطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِنْهُمْ، وَلَا نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ. وَنُبْغِضُ مَنْ يُبْغِضُهُمْ، وَبِغَيْرِ الخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ، وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ. وَحُبُّهُمْ: دِينٌ وَإِيمَانٌ وَإِحْسَانٌ. وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ. (العقيدة الطحاوية)

٥. ومن قال الحسنى في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد برئ من النفاق.

٦. ثم إن الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة، ومن لابس الفتنة منهم فكذلك، بإجماع العلماء الذين يعتد بهم في الإجماع، إحسانا للظن بهم، ونظرا إلى ما تمهد لهم من المآثر، وكان الله سبحانه وتعالى أتاح الإجماع على ذلك لكونهم نقلة الشريعة. (مقدمة ابن الصلاح)

٧. إِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يَنْتَقِصُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعْلَمْ أَنَّهُ زِنْدِيقٌ , وَذَلِكَ أَنَّ الرَّسُولَ





উযূর মাসাইল

মো. মুহিবুর রহমান

১ম পর্ব

ইসলামে নির্দেশিত অন্যতম মৌলিক ইবাদত হলো নামায। প্রাপ্তবয়স্ক, সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন সকল নর-নারীর উপর আল্লাহ তাআলা পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। নামায আদায়ের জন্য তাহারাত অর্জন করা ফরয। তাহারাতের পদ্ধতি তিনটি- উযূ, গোসল এবং তায়াম্মুম। কেউ উযূবিহীন অবস্থায় থাকলে উযূ করে, গোসল ফরয অবস্থায় থাকলে গোসল করে পবিত্রতা অর্জন করা ফরয। পানি ব্যবহারে অক্ষম হলে অথবা পানি পাওয়া না গেলে পবিত্রতা অর্জনের জন্য উযূ-গোসলের পরিবর্তে তায়াম্মুম করা যাবে। উযূর মাসাইল সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার লক্ষ্যে এই প্রবন্ধ রচিত হয়েছে।

উযূ ব্যতীত নামায আদায় করা জায়িয নেই এবং তা কবূল হয় না। আব্দুল্লাহ ইবন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি-

لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ

-তাহারাত ব্যতীত সালাত কবূল হয় না। খিয়ানতের সম্পদ থেকে সাদাকাহ কবূল হয় না।[১] আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

لاَ تُقْبَلُ صَلاَةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ. قَالَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ مَا الْحَدَثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ فُسَاءٌ أَوْ ضُرَاطٌ.

-যে ব্যক্তির হাদাস হয়, তার সালাত কবূল হবে না, যতক্ষণ না সে উযূ করে। হাদরা-মাওতের এক ব্যাক্তি বলেন, হে আবূ হুরাইরা! হাদাস কী? তিনি বলেন, নিঃশব্দে বা সশব্দে বায়ু বের হওয়া।[২]

১. উযূ সহীহ হওয়ার পূর্বশর্ত

উযূ সঠিকভাবে আদায় হওয়ার জন্য কতিপয় পূর্বশর্ত রয়েছে, যা পূরণ না করে উযূ করলে উযূ হয় না। যেমন:

এক. উযূর অঙ্গসমূহের সমস্ত ত্বকে পবিত্র পানি পৌঁছে দেওয়া। এমনকি যদি সূঁচের মাথার সমান কোনো স্থানেও পানির স্পর্শ না হয়, তবে উযূ সঠিক হবে না।[৩]

দুই. উযূর বিপরীত বিষয়সমূহ যথা: হায়িয, নিফাস, হাদাস ইত্যাদি বন্ধ থাকা।[৪] তাই হায়িয ও নিফাস শেষ হওয়ার আগে উযূ করলে উযূ করেছেন বলে গণ্য করা হবে না। একইভাবে পেশাবের ফোঁটা পড়া অথবা রক্ত গড়িয়ে পড়া বন্ধ হওয়ার পর উযূ করতে হবে।

তিন. এমন জিনিস অপসারিত হওয়া, যা শরীরে পানি পৌঁছতে বাঁধা দেয়। যেমন: মোম ও চর্বি।[৫] অনুরূপভাবে মাছের আঁশ, চিবানো শুকনো রুটি এবং নাকের শুকনো ময়লা ত্বকে পানি পৌঁছতে বাঁধা দেয়।[৬] হাতে-পায়ে ব্যবহৃত নখপালিশ বা এরকম যেকোনো প্রসাধনী বা বস্তু, যা উযূর অঙ্গসমূহে পানি পৌঁছতে বাঁধা প্রদান করে, তা অপসারণ না করে উযূ করলে উযূ আদায় হবে না। যে লিপস্টিকের কারণে ঠোঁটে পানি পৌঁছায় না, সেই লিপস্টিক ঠোঁটে লাগানো অবস্থায় উযূ করলে উযূ হবে না। কিন্তু হাতে-পায়ে মেহেদির রং থাকলে তা সহ উযূ করা যাবে, কেননা তাতে পানি পৌঁছতে বাঁধাপ্রাপ্ত হয় না।

২. উযূর রুকন তথা ফরয আমলসমূহ

উযূর রুকন চারটি। অর্থাৎ উযূতে চারটি কাজ করা ফরয। এর কোনো একটি বাদ পড়লে উযূ হবে না। যথা:

এক. মুখমণ্ডল ধোয়া। মাথার চুলের গোড়া থেকে থুতনির নিচ পর্যন্ত এবং এক কানের লতি থেকে অপর কানের লতি পর্যন্ত পুরো মুখমণ্ডল ধোয়া।

দুই. উভয় হাত কনুইসহ ধোয়া।

তিন. মাথার এক-চতুর্থাংশ মাসেহ করা।

চার. উভয় পা গোড়ালিসহ ধোয়া।[৭]

উযূতে এই চারটি কাজের নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

-হে মুমিনগণ! যখন তোমরা সালাতের উদ্দেশ্যে দাঁড়াও, তখন (সালাতের পূর্বে) তোমাদের মুখমণ্ডল ধৌত কর এবং হাতগুলোকে কনুই পর্যন্ত ধুয়ে নাও, আর মাথা মাসেহ কর এবং পা গুলোকে টাখনু পর্যন্ত ধুয়ে ফেল।[৮]

আলোচ্য আয়াত থেকে প্রমাণ হলো যে, উযূতে তিনটি অঙ্গ ধোয়া এবং মাথা মাসেহ করা ফরয।[৯] ধোয়ার বিধানের অন্তর্ভুক্ত তিনটি অঙ্গ হলো মুখমণ্ডল, উভয় হাত এবং উভয় পা। এগুলোকে তিনটি বলা হলেও প্রকৃতপক্ষে তা পাঁচটি। উভয় হাত এবং উভয় পা হুকুমের ক্ষেত্রে পৃথক অঙ্গ হিসেবে বিবেচিত।[১০] ধোয়া দ্বারা উদ্দেশ্য হলো পানি প্রবাহিত করা।[১১] এমনভাবে পানি প্রবাহিত করা যেন অন্ততপক্ষে এক ফোঁটা পানি গড়িয়ে পড়ে।[১২] আর মাসেহ করার অর্থ হলো ভিজা হাত লাগানো।[১৩]

উযূতে উপর্যুক্ত চারটি ফরয কাজের সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত মাসাইল নিচে উল্লেখ করা হলো:

প্রথম ফরয: মুখমণ্ডল ধোয়া

পুরো মুখমণ্ডল একবার ধোয়া ফরয। তিন বার ধোয়া সুন্নাত। মুখমণ্ডলের সীমানা হলো মাথার অগ্রভাগের চুলের গোড়া থেকে থুতনির নিচ পর্যন্ত এবং এক কানের লতি থেকে অপর কানের লতি পর্যন্ত পুরো মুখমণ্ডল ধোয়া।[১৪]

টাক পড়ার কারণে মাথার সামনের অংশের চুল পড়ে গেলে সেই স্থান পর্যন্ত পানি পৌঁছানো ওয়াজিব নয়।[১৫]

চোখের ভেতরের অংশে পানি পৌঁছানো ওয়াজিব নয়, সুন্নাতও নয়।[১৬] তবে চোখের কোণে পানি পৌঁছানো ওয়াজিব।[১৭] পীড়ার কারণে চোখে যদি পিচুটি জমে যায় এবং অবস্থা এমন হয় যে, চোখ বন্ধ করলে পিচুটি চোখের বাইরে বেরিয়ে থাকে, তবে পিচুটির নিচে পানি পৌঁছানো ওয়াজিব। এরূপ না হলে পানি পৌঁছানো ওয়াজিব নয়।[১৮]

উভয় ঠোঁট মিলিয়ে রাখার সময় যে অংশ প্রকাশমান থাকে, তা মুখমণ্ডলের মধ্যে শামিল, অতএব তাতে পানি পৌঁছানো ওয়াজিব। আর উভয় ঠোঁট মিলিয়ে রাখার সময় যে অংশটুকু অপ্রকাশমান থাকে, তা মুখের ভেতরের অংশের মধ্যে শামিল, তাতে পানি পৌঁছানো ওয়াজিব নয়। এটাই বিশুদ্ধ মত।[১৯]

কানের লতি এবং কান বরাবর গালের উপরের দিকে উদগত চুলের মধ্যস্থিত চুলহীন শুভ্রস্থান উযূর সময় ধোয়া ফরয।[২০]

এমন ঘন দাড়ি, যার নিচের ত্বক দেখা যায় না, তার উপরের অংশ ধৌত করতে হবে। এটা তার নিচের ত্বক ধোয়ার স্থলাভিষিক্ত হয়ে যাবে। কিন্তু দাড়ি যদি পাতলা হয় এবং তার নিচের ত্বক দৃশ্যমান হয়, তাহলে ত্বক পর্যন্ত পানি পৌঁছানো এবং ধোয়া আবশ্যক। তবে মুখের সীমার বাইরে দাড়ির ঝুলন্ত অংশ ধোয়া ওয়াজিব নয়।[২১] দাড়ি ঘন হলে নিচের ত্বকে পানি পৌঁছানো ওয়াজিব নয়, এর স্বপক্ষে কয়েকটি দলীল রয়েছে। তন্মধ্যে অন্যতম হলো, ইমাম বুখারী (র.) হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উযূর বিবরণ দিতে গিয়ে বলেছেন,

ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَجَعَلَ بِهَا هَكَذَا، أَضَافَهَا إِلَى يَدِهِ الْأُخْرَى، فَغَسَلَ بِهِمَا وَجْهَهُ.

-এরপর আর এক আঁজলা পানি দিয়ে এরূপ করলেন অর্থাৎ আরেক হাতের সাথে মিলিয়ে দুই হাত দিয়ে মুখমণ্ডল ধুলেন।[২২]

অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দাড়ি ছিল ঘন। বারা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا مَرْبُوعًا عَرِيضَ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ، كَثَّ اللِّحْيَةِ، تَعْلُوهُ حُمْرَةٌ

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অবয়ব ছিল মধ্যম ধরনের। তাঁর কাঁধের মধ্যবর্তী স্থান ছিল প্রশস্ত, তাঁর দাড়ি ছিল ঘন, যার উপরিভাগে রক্তিমাভা বিরাজ করতো।[২৩] আর তাঁর দাড়ি যেহেতু ঘন ছিল, তাই সাধারণত এক আঁজলা পানি দ্বারা দাড়ির নিচের চামড়া পর্যন্ত পানি পৌঁছানো সম্ভব নয়।[২৪] অতএব দাড়ির উপরের অংশ ধৌত করাই যথেষ্ট হবে, দাড়ির নিচের ত্বক ধৌত করা দরকার নেই।

ভ্রু, গোঁফ এবং আনফাকাহ (নিচের ঠোঁট ও চিবুকের মধ্যবর্তী ক্ষুদ্র কেশগুচ্ছ)-এর হুকুম দাড়ির হুকুমের ন্যায়।[২৫] ভ্রু এবং গোঁফের চুলের নিচে পানি পৌঁছানো ওয়াজিব নয়।[২৬]

থুতনির উপর উত্থিত দাড়িতে পানি প্রবাহিত করার পর তা মুণ্ডিয়ে ফেললে পুনরায় থুতনি ধৌত করা ওয়াজিব নয়। অনুরূপভাবে ভ্রু, গোঁফ বা মাথা মাসেহ করার পর এ স্থানসমূহ মুণ্ডিয়ে ফেললে অথবা উযূ করার পর নখ কাটলে এ স্থানগুলো পুনরায় ধৌত করা ওয়াজিব নয়।[২৭]

দ্বিতীয় ফরয: উভয় হাত কনুইসহ ধোয়া

উভয় হাত কনুইসহ একবার ধোয়া ফরয। তিনবার ধোয়া সুন্নাত। হাত ধোয়ার মধ্যে কনুইও শামিল।[২৮] কনুইসহ উভয় হাত ধৌত করা ফরয। আল্লাহ তাআলার বাণী: وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ-হাতগুলোকে কনুই পর্যন্ত ধৌত কর থেকে এটাই বুঝা যায়। আর এ ব্যাপারে ইজমা হয়েছে। চার মাযহাবের ইমামগণসহ জমহুর আলিমগণ কনুইকে হাত ধোয়ার অন্তর্ভুক্ত করা ওয়াজিব বলেছেন। কেননা إِلَى শব্দটি সীমানার পরিসমাপ্তি لانتهاء الغاية বুঝায় এবং এটা এখানে (مع অর্থাৎসহ) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।[২৯] কুরআনের এই আয়াতের ব্যাখ্যায় নিম্নোক্ত হাদীসটি গুরুত্বপূর্ণ। আবূ হুরাইরা (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উযূর বিবরণ দিতে গিয়ে নিজে উযূ করে দেখিয়েছেন। তাতে রয়েছে-

ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي الْعَضُدِ، ثُمَّ يَدَهُ الْيُسْرَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي الْعَضُدِ

-তারপর তিনি ডান হাত ধুইলেন, এমনকি বাহুর কিছু অংশও ধুয়ে ফেললেন। তারপর বাম হাতও বাহুর কিছু অংশসহ ধুয়ে ফেললেন।[৩০]

তবে কনুই ধোয়া ফরয হওয়ার ব্যাপারে যেসকল দলীল প্রদান করা হয়, তা দ্বারা ফরযিয়্যাত প্রমাণিত হয় না। এ ব্যাপারে উপযুক্ত কথা হলো, কনুই ধোয়া আবশ্যক হওয়ার ব্যাপারে ইজমা দ্বারা দলীল প্রদান করাই উত্তম।[৩১] এ ব্যাপারে ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, উযূর ক্ষেত্রে কনুই ধোয়া বাধ্যতামূলক হওয়ার বিরোধিতা করেছেন, এমন কারো সম্পর্কে আমি জানি না।[৩২] এটি তাঁর কাছ থেকে ইজমার বর্ণনা।[৩৩]

নখ যদি এমন লম্বা হয় যে, এতে অঙ্গুলির অগ্রভাগ ঢেকে যায় তবে নখের নিচে পানি পৌঁছানো ওয়াজিব। নখ ছোট হলে নখের নিচে পানি পৌঁছানো ওয়াজিব হবে না।[৩৪]

খিযাব শুকিয়ে জমে গেলে উযূ-গোসল কিছুই শুদ্ধ হবে না।[৩৫]

আংটি ঢিলা থাকলে তা নেড়ে-চেড়ে উযূ করা সুন্নাত। আর আংটি সংকীর্ণ বা আঙ্গুলের সাথে লাগানো থাকলে এবং এ অবস্থায় আংটির নিচে পানি না পৌঁছলে, আংটি নাড়াচাড়া দিয়ে এর নিচে পানি পৌঁছানো ফরয।[৩৬]

তৃতীয় ফরয: মাথা মাসেহ করা

উযূতে একবার মাথা মাসেহ করা ফরয। অন্যান্য কাজ তিনবার করা সুন্নাত হলেও মাথা মাসেহ তিনবার করা সুন্নাত নয় বরং মাকরূহ। মাথা মাসেহ করা বলতে ভেজা হাত দিয়ে চুলের উপর স্পর্শ করাকে বুঝায়। আল কুরআনে শুধু মাথা মাসেহ করার কথা বলা হয়েছে। কতটুকু মাসেহ করতে হবে তার পরিমাণ আল্লাহ তাআলা নির্ধারণ করেননি। এজন্য ফুকাহায়ে কিরাম এর পরিমাণ বর্ণনা করতে ইখতিলাফ করেছেন। হানাফী ফকীহগণও এ ব্যাপারে তিন ধরনের মতামত দিয়েছেন।

প্রথম মতামত: (مَسْح رُبُع الرَّأْسِ) মাথার এক-চতুর্থাংশ পরিমাণ একবার মাসেহ করা ফরয।[৩৭] মাথার যেকোনো পাশ থেকে এক-চতুর্থাংশ পরিমাণ মাসেহ করলে আদায় হয়ে যাবে।[৩৮]

দ্বিতীয় মতামত: (مِقْدَار النَّاصِيَةِ) মাথা মাসেহ-এর ক্ষেত্রে الناصية অর্থাৎ মাথার সম্মুখভাগের চুলের সমপরিমাণ জায়গা স্পর্শ করা ফরয। হিদায়া গ্রন্থকার এই الناصية-কেই رُبُع الرَّأْسِ তথা মাথার এক-চতুর্থাংশ পরিমাণ বলে ব্যাখ্যা করেছেন।[৩৯] যেহেতু আল-কুরআনের বক্তব্য এখানে পরিমাণের দিক থেকে অস্পষ্ট, সেহেতু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীসকে তার ব্যাখ্যারূপে যুক্ত করা হয়। মুগিরাহ ইবন শুবাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

تَخَلَّفَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَتَخَلَّفْتُ مَعَهُ، فَلَمَّا قَضَى حَاجَتَهُ قَالَ: أَمَعَكَ مَاءٌ؟ فَأَتَيْتُهُ بِمِطْهَرَةٍ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَهُ...وَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَعَلَى خُفَّيْهِ.

(এক সফরে) রাসূলুল্লাহ ﷺ পিছনে থেকে গেলেন। আমিও তার সাথে পিছনে পড়লাম। তিনি হাজত পূরণ করে বললেন, তোমার সাথে কি পানি আছে? আমি একটি পানির পাত্র নিয়ে এলাম। তিনি উভয় হাতের কব্জি পর্যন্ত এবং মুখমণ্ডল ধুলেন... তারপর মাথার সম্মুখভাগ এবং পাগড়ি ও উভয় মোজার উপর মাসেহ করলেন।[৪০]

তৃতীয় মতমত: (مِقْدَارُ ثَلَاثَةِ أَصَابِعَ) হাতের তিন আঙ্গুল পরিমাণ মাসেহ করা ফরয।[৪১] কেননা তা (তিন আঙ্গুল) প্রকৃতপক্ষে যে অঙ্গ দ্বারা মাথা মাসেহ করা হয়, তার (হাতের) সিংহভাগ।[৪২] মাথা মাসেহ-এর ক্ষেত্রে হাতের তিন আঙ্গুল ব্যবহার করা ওয়াজিব। যদি কোনো ব্যক্তি এক বা দুই আঙ্গুল দিয়ে মাথা মাসেহ করে, তবে উযূ জায়িয হবে না।[৪৩]

অগ্রাধিকার প্রাপ্ত মতামত: উপর্যুক্ত তিনটি মতামত উল্লেখ করে ইবন আবিদীন (র.)

মাথার এক-চতুর্থাংশ পরিমাণ মাসেহ করা ফরয হওয়ার মতামতকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন । আর এটা মুতাআখখিরীন ফকীহগণও পছন্দ করেছেন।[৪৪] তবে এক্ষেত্রে লক্ষণীয় হলো উযূতে পুরো মাথা মাসেহ করা সুন্নাত। আর এই সুন্নাতের উপর গুরুত্ব সহকারে আমল করলে সকল মতামতের উপরই আমল হয়ে যায়।

মাথা মাসেহ সম্পর্কিত অন্যান্য মাসাইল

কারো মাথায় যদি লম্বা চুল থাকে এবং সে তিন আঙ্গুল দ্বারা তা মাসেহ করে, তবে মাথার উপরস্থ চুলের উপর মাসেহ করলে তার মাসেহ শুদ্ধ হবে। আর যদি সে কপাল বা ঘাড়ের উপরস্থ চুলের উপর মাসেহ করে, তবে তার মাসেহ সহীহ হবে না।[৪৫]

যদি হাতের তালু ভিজা থাকে এবং এর দ্বারা মাথা মাসেহ করা হয়, তবে মাসেহ জায়িয হবে; চাই পানি পাত্র হতে গ্রহণ করা হোক বা হাত ধোয়ার পর হাতের আর্দ্রতা থেকে গ্রহণ করা হোক, উভয় অবস্থাতেই উযূ জায়িয হবে। এটাই বিশুদ্ধ মত। কিন্তু মোজার উপর মাসেহ করার পর যদি হাত ভিজা থাকে, তবে এর দ্বারা মাথা মাসেহ করা জায়িয হবে না। অনুরূপভাবে মাথা মাসেহ করার পর হাত যদি ভিজা থাকে, তবে এর দ্বারা মোজার উপর মাসেহ জায়িয হবে না।[৪৬]

কোনো ভিজা অঙ্গ হতে হাত ভিজিয়ে নিয়ে মাথা মাসেহ করলে মাসেহ আদায় হবে না। চাই সে অঙ্গটি উযূতে ধৌত করা হয় এমন অঙ্গ হোক বা উযূতে মাসেহ করা হয় এমন অঙ্গ হোক।[৪৭]

কেউ যদি মাথা মাসেহ করতে ভুলে যায় অতঃপর দাড়িতে লেগে থাকা পানি হাতে লাগিয়ে মাথা মাসেহ করে, তাহলে মাসেহ আদায় হবে না। কেননা এই মাসেহ হয়ে যায় ব্যবহৃত পানি দ্বারা।[৪৮] অথচ ব্যবহৃত পানি নিজে পবিত্র হলেও মানুষকে পবিত্র করতে পারে না।

কেউ যদি বরফ দ্বারা মাথা মাসেহ করে, তবে মাসেহ সহীহ হবে।[৪৯]

টুপি, পাগড়ি, বোরখা-নেকাব এবং হাতমোজার উপর মাসেহ করা জায়িয নেই।[৫০] কেননা এতে মাথায় পানি পৌঁছতে বাধাপ্রাপ্ত হয়।

অনুরূপভাবে মহিলাদের জন্য মাথার ওড়নার উপর মাসেহ করাও জায়িয নেই। হ্যাঁ পানি যদি ফোঁটা ফোঁটা করে এমনভাবে গড়িয়ে পড়ে যে, এতে মাথার চুল ভিজে যায়, তবে মাসেহ আদায় হয়ে যাবে।[৫১]

চতুর্থ ফরয: উভয় পা গোড়ালিসহ ধোয়া

পায়ের আঙুলের অগ্রভাগ থেকে টাখনু পর্যন্ত ধোয়া ফরয। উভয় টাখনু পা ধৌত করার মধ্যে শামিল।[৫২] আল্লাহ তাআলার বাণী-وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ-"পা গুলোকে টাখনু পর্যন্ত ধৌত কর" থেকে এটাই বুঝা যায়। আর আবূ হুরাইরা (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উযূর বিবরণ দিতে গিয়ে নিজে উযূ করে দেখিয়েছেন। তাতে রয়েছে-

ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ

-তারপর তিনি ডান পা ধুইলেন এমনকি গোছারও কিছু অংশ ধুয়ে ফেললেন। তারপর বাম পা গোছার কিছু অংশসহ ধুইলেন।[৫৩] হাত ধোয়ার আলোচনায় কনুইসহ হাত ধোয়া সম্পর্কিত ব্যাখ্যা এখানেও প্রযোজ্য।

যদি কারো হাত কনুইসহ এবং পা টাখনুসহ কেটে যায়, তবে তা আর ধৌত করার হুকুমের অন্তর্ভুক্ত থাকবে না। যদি কিছু অংশ বাকি থাকে, তবে তা ধৌত করতে হবে।[৫৪]

উযূর ফরয সম্পর্কিত অন্যান্য মাসাইল

উযূর অঙ্গসমূহে ঘা বা কাটা অংশ ধোয়া অসম্ভব হলে তা ধোয়া ফরয নয়। বরং এর উপর দিয়ে পানি গড়িয়ে দিবে। পানি গড়িয়ে দেওয়াও অসম্ভব হলে ধোয়ার পরিবর্তে মাসেহ করাই যথেষ্ট হবে। মাসেহ করাও যদি অসম্ভব হয়, তবে মাসেহ করবে না। বরং এ স্থানটি বাদ দিয়ে এর চতুষ্পার্শ ধুয়ে নিবে।[৫৫]

উযূর কোনো অঙ্গের একটি অংশ যদি শুকনো থেকে যায়, এতে পানি না পৌঁছে, তবে একই অঙ্গের অন্য অংশের পানি দিয়ে তা ভিজিয়ে দিলে উযূ হয়ে যাবে। কিন্তু যদি এক অঙ্গের পানি দিয়ে অন্য কোনো অঙ্গের শুকনো অংশ ভিজিয়ে দেওয়া হয়, তবে তাতে উযূ হবে না।[৫৬]

কোনো ব্যক্তি যদি বৃষ্টির পানিতে ভিজে যায় অথবা কেউ যদি প্রবাহিত নহর বা খালে পতিত হয় (এবং এতে উযূর অঙ্গসমূহ ধোয়া হয়ে যায়), তবে তার উযূ হয়ে যাবে।[৫৭] অর্থাৎ কোনোভাবে যদি তার শরীরের উযূর অঙ্গসমূহে পানি প্রবাহিত হয়ে যায়, তাহলে তার উযূ হয়ে যাবে। কেননা উযূতে নিয়ত শর্ত নয়।

---

১. সহীহ মুসলিম, কিতাবুত তাহারাত, বাবু উজুবিত তাহারাতি লিস সালাহ, হা: ২২৪;
২. সহীহ বুখারী, কিতাবুল উযূ, বাবুন লা তুকবালু সালাতুন বিগাইরি তুহুরিন, হা: ১৩৫;
৩. মারাকিল ফালাহ, পৃ. ৬১;
৪. নুরুল ইদাহ, পৃ. ২১;
৫. নুরুল ইদাহ, পৃ. ২১;
৬. হাশিয়াতুত তাহতাভী, পৃ. ৬৩;
৭. নুরুল ইদাহ, পৃ. ২০;
৮. সুরা মায়িদাহ, আয়াত- ৬;
৯. মুখতাসারুল কুদুরী, পৃ. ১১; আল-হিদায়া, খ. ১, পৃ. ১৪;
১০. আল জাওহারাতুন নায়্যিরাহ, খ. ১, পৃ. ৪;
১১. আল হিদায়া, খ. ১, পৃ. ১৪;
১২. আদ দুররুল মুখতার, পৃ. ১৯;
১৩. আল জাওহারাতুন নায়্যিরাহ, খ. ১, পৃ. ৩; আল হিদায়া, খ. ১, পৃ. ১৪;
১৪. নুরুল ইদাহ, পৃ. ২০;
১৫. আল ফাতাওয়া আল হিন্দিয়্যাহ, খ. ১, পৃ. ৪;
১৬. আল ফাতাওয়া আল হিন্দিয়্যাহ, খ. ১, পৃ. ৪;
১৭. আল ফাতাওয়া আল নহিন্দিয়্যাহ, খ. ১, পৃ. ৪;
১৮. আল ফাতাওয়া আল হিন্দিয়্যাহ, খ. ১, পৃ. ৪;
১৯. আল মুহিতুল বুরহানী, খ. ১, পৃ. ৩৩; হাশিয়াতুত তাহতাভী, পৃ. ৬২; আল ফাতাওয়া আল হিন্দিয়্যাহ, খ. ১, পৃ. ৪;
২০. হাশিয়াতুত তাহতাভী, পৃ.৫৮; বাদাইউস সানাঈ, খ. ১, পৃ. ৪; আল ইখতিয়ার লিতা'লিল মুখতার, খ. ১, পৃ. ৭; আল মুহিতুল বুরহানী, খ. ১, পৃ. ৩৫;
২১. আল ফিকহুল হানাফী ফী সাওবিহিল জাদীদ, খ. ১, পৃ. ৭১; বাদাইউস সানাঈ, খ. ১, পৃ. ৪;
২২. সহীহ বুখারী, হাদীস-১৪০;
২৩. সুনানুন নাসাঈ, হাদীস-৫২৩২;
২৪. আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু, খ. ১, পৃ. ৩৬৯;
২৫. আল ফিকহুল হানাফী ফী সাওবিহিল জাদীদ, খ. ১, পৃ. ৭১;
২৬. আল বাহরুর রাইক, খ. ১, পৃ. ১২;
২৭. আল ফাতাওয়া আল হিন্দিয়্যাহ, খ. ১, পৃ. ৪;
২৮. আল মাবসুত লিস সারাখসি, খ. ১, পৃ. ৬; আল মুহিতুল বুরহানী, খ. ১, পৃ. ৩৫;
২৯. আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু, খ. ১, পৃ. ৩৭০;
৩০. সহীহ মুসলিম, হাদীস-২৪৬;
৩১. আল বাহরুর রাইক, খ. ১, পৃ. ১৩;
৩২. আল উম্ম, খ. ১, পৃ. ৪০; ইলাউস সুনান, খ. ১, পৃ. ৩৬-৩৭;
৩৩. ইলাউস সুনান, খ. ১, পৃ. ৩৬-৩৭; আল বাহরুর রাইক, খ. ১, পৃ. ১৩;
৩৪. আল মুহিতুল বুরহানী, খ. ১, পৃ. ৩৬;
৩৫. তাবয়িনুল হাকাইক, খ. ১, পৃ. ১৩; আল ফাতাওয়া আল হিন্দিয়্যাহ, খ. ১, পৃ. ৪;
৩৬. আল মুহিতুল বুরহানী, খ. ১, পৃ. ৩৬;
৩৭. আদ দুররুল মুখতার, পৃ. ২০;
৩৮. আল জাওহারাতুন নায়্যিরাহ, খ. ১, পৃ. ৪;
৩৯. আল হিদায়া, খ. ১, পৃ. ১৫;
৪০. সহীহ মুসলিম, হা:২৭৪; আস সুনানুল কুবরা লিন নাসাঈ, হা:১০৯, ১১২;
৪১. আল মুহিতুল বুরহানী, খ. ১, পৃ. ৩৬; আল ফাতাওয়া আল হিন্দিয়্যাহ, খ. ১, পৃ. ৫;
৪২. আল হিদায়া, খ. ১, পৃ. ১৫;
৪৩. আন নিহায়াহ ফী শারহিল হিদায়াহ, খ. ১, পৃ. ৪৮; আল ফাতাওয়া আল হিন্দিয়্যাহ, খ. ১, পৃ. ৫;
৪৪. রদ্দুল মুহতার, খ. ১, পৃ. ৯৯; আল মুহিতুল বুরহানী, খ. ১, পৃ. ৩৬;
৪৫. আল মুহিতুল বুরহানী, খ. ১, পৃ. ৩৬; আল ফাতাওয়া আল হিন্দিয়্যাহ, খ. ১, পৃ. ৬;
৪৬. আল ফাতাওয়া আল হিন্দিয়্যাহ, খ. ১, পৃ. ৬;
৪৭. আল ফাতাওয়া আল হিন্দিয়্যাহ, খ. ১, পৃ. ৬;
৪৮. আল মুহিতুল বুরহানী, খ. ১, পৃ. ৩৮;
৪৯. আল ফাতাওয়া আল হিন্দিয়্যাহ, খ. ১, পৃ. ৬;
৫০. মাজমাউল আনহুর, খ. ১, পৃ. ৫০; মুখতাসারুল কুদুরী, পৃ. ১৮;
৫১. আল মাবসুত লিস সারাখসি, খ. ১, পৃ. ১০১; আল বাহরুর রাইক, খ. ১, পৃ. ১৯৩;
৫২. আল মুহিতুল বুরহানী, খ. ১, পৃ. ৩৯;
৫৩. সহীহ মুসলিম, হা:২৪৬;
৫৪. আল বাহরুর রাইক, খ. ১, পৃ. ১৪;
৫৫. আল ফাতাওয়া আল হিন্দিয়্যাহ, খ. ১, পৃ. ৫;
৫৬. আল ফাতাওয়া আস সিরাজিয়্যাহ, খ. ১, পৃ. ২৫; আল ফাতাওয়া আল হিন্দিয়্যাহ, খ. ১, পৃ. ৫;
৫৭. আল ফাতাওয়া আস সিরাজিয়্যাহ, খ. ১, পৃ. ২৮; আল ফাতাওয়া আল হিন্দিয়্যাহ, খ. ১, পৃ. ৫;

শিশুর বেড়ে ওঠার সময় লালন-পালন ও তারবিয়াত

মূল: হুজ্জাতুল ইসলাম আবূ হামিদ আল গাযালী রাহিমাহুল্লাহ
অনুবাদ: ইমাদ উদ্দীন তালুকদার

জেনে রাখুন, শিশু লালন পালনের পদ্ধতির দিক অনেক গুরুত্বপূর্ণ ও সাধারণ কাজ থেকে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিষয়। সন্তান হচ্ছে পিতামাতার নিকট আমানত। শিশুর মন পবিত্র, যা মনিমুক্তোর মত মূল্যবান, সকল প্রকার পাপ-পঙ্কিলতার চিত্র এবং অবাধ্যতার কপটতা থেকে মুক্ত থাকে। এজন্য তাকে যে দিকে নিয়ে যাওয়া হবে, সে দিকেই ধাবিত থাকবে এবং তার জীবনের জন্য যে চিত্র অঙ্কন করতে চাওয়া হবে, তা সে গ্রহণ করতে পারবে। যদি তাকে ভালো পথে পরিচালনা করা হয়, ভালো কিছু শেখানো হয়, তাহলে শিশু সেই কল্যাণের মাঝেই বড় হবে আর ইহকাল-পরকাল উভয় জগতে লাভবান হবে। তার এই সৌভাগ্যের প্রতিদানে পিতা-মাতা, প্রত্যেক শিক্ষক এবং শিষ্টাচারের জ্ঞানদানে জড়িত ব্যক্তিরাও সাওয়াবের অংশীদার হবেন। অন্যদিকে যদি অকল্যাণের মাঝে প্রতিপালন করা হয় আর পশুদের মত খামখেয়ালিপূর্ণ জীবনে অভ্যস্ত করা হয়, তাহলে সে কল্যাণ বঞ্চিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে দুর্গম গর্তে পতিত হয়। এই কঠিন পরিণতির দায়ভারের একটা অংশ অভিভাবকের উপরও বর্তায়। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

-হে ঈমানদারগণ, তোমরা নিজেদের ও তোমাদের পরিজনকে দুযখের অগ্নি হতে রক্ষা কর।[১]

যেহেতু পিতামাতা সন্তানকে ইহকালীন কষ্ট ক্লেশের যাতনা থেকে নিরাপদ রাখতে সতর্ক থাকেন, সেখানে পরকালীন কঠিন অগ্নিতে দগ্ধ হওয়া থেকে সন্তানকে নিরাপদ রাখার সচেতনতা আরও বেশি গুরুত্ব পাওয়ার দাবিদার। তাকে শিষ্টাচার, সামাজিকতা, উত্তম চরিত্রের শিক্ষাদান, খারাপ কাজের উৎস থেকে দূরে রাখার মাধ্যমে রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে।

উচিত হবে, সন্তানকে বিলাসিতার প্রতি না ঝুঁকানো, চাকচিক্য ও শৌখিনতায় ভালবাসা তৈরি না করা। কারণ বড় হলে এই খায়েশ পূরণের তালাশেই তার জীবন বিনাশ করে দিবে। বরং উচিত হলো, সন্তানের জীবনের শুরুলগ্নেই তার প্রতিটি বিষয়ে পর্যবেক্ষণ করা। এমনকি শিশুর দেখভাল বা দুধ মা হিসেবেও কাউকে রাখতে হলে দ্বীনদার ও হালাল ভক্ষণকারী মহিলা ছাড়া অন্য কাউকে নিয়োগ না করা। কেননা হারাম পথে দোহন করা দুধের মাঝেও কিন্তু কোনো বরকত নেই, যখন এই মন্দ জিনিসটি শিশুর মাঝে প্রবিষ্ট হবে, তার অস্তিমজ্জাই হারামে আচ্ছাদিত হবে। এতে করে তার চরিত্র খারাপকে ধারণের দিকেই ধাবিত হয়ে পড়বে। শিশুর ভালো মন্দ অনুধাবনের বয়স হলে উচিত তার তদারকি আরও উত্তমরূপে করা। এক্ষেত্রে শুরুতেই লজ্জাশীলতার বিকাশ ঘটানো। কেননা যখন সে শালীন ও লজ্জাশীল হবে আর সাথে কিছু মন্দকাজ বাদ দিবে, তখন তা শিশুর জন্য জ্ঞানের রাজ্যে উষালগ্নের বিকিরণের মত হবে। তখন তার নিকট কিছু কাজ ভালো আর কিছু কাজ মন্দে পরিণত হবে, ফলে উত্তম কর্ম ত্যাগ করে মন্দ কাজ করতে গেলে লজ্জা লাগবে। এই অনুভূতি তার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে হাদীয়াস্বরূপ আর এমন সৌভাগ্যের বিষয়, যা তার চরিত্রের ভারসাম্যতা, মনের পরিশুদ্ধিতার ইঙ্গিত প্রদান করে। এই গুণ তার জন্য তার পরিণত বয়সে জ্ঞানের পূর্ণতার সুসংবাদ দেয়।

শিশুকে খাবার গ্রহণের শিষ্টাচার শেখানো

উত্তম গুণ লজ্জাশীলতায় গুণান্বিত শিশুকেও বেশি সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা উচিত নয়, বরং তাকে শিষ্টাচার ও তা অনুধাবনের শিক্ষায় গড়ে তুলতে হবে। সকল মন্দ আচরণের মাঝে শিশুর সর্বপ্রথম মজাদার খাবারের প্রতি অতি আগ্রহের মন্দ দিক প্রকাশিত হয়। খাবার সংক্রান্ত মন্দাভ্যাস থেকে বিরত থাকার গুণ শিক্ষা দিতে হবে। করণীয় হলো, খাবারের আদব শেখানো। যেমন, তার উচিত- ১) ডান হাত দিয়ে খাবার খাওয়া ২) বিসমিল্লাহ বলে শুরু করা ৩) হাতের নাগালের খাবার আগে নেওয়া ৪) অন্য কেউ খাওয়ার আগে খাবার না নেওয়া ৫) অন্যের আহার বা যে খাচ্ছে তার দিকে লোলুপ দৃষ্টি না দেওয়া ৬) খাবার গ্রহণে তাড়াহুড়ো না করা ৮) প্রতিটি লোকমা পরিমাণমত চর্বণ করা ৯) একটা লোকমা শেষের পর আরেকটা নেওয়া ১০) খাবারের পর ঝুটা পরিধেয় কাপড় দিয়ে না মোছা ১০) মাঝে মাঝে শিশুকে কোনো তরকারি বা মসলা ছাড়া কেবল রুটি খেতে দিতে হবে, যাতে রুটির সাথে কিছু খাওয়াকে সে আবশ্যক মনে না করে ১১) অতি ভোজনকে শিশুর সামনে নিন্দনীয় উপস্থাপন করা উচিত। এভাবে যে– বেশি খাওয়াকে পশুর আচরণের সাথে সাদৃশ্য প্রদান এবং ভোজরসিক শিশুর নিন্দা করা আর ভদ্র, স্বল্পভোজি শিশুর প্রশংসা করার মাধ্যমে অধিক আহারের প্রতি অনাগ্রহী করে তুলতে হবে ১২) শিশুকে নিজে খাওয়ার বদলে অন্যকে বা অনাহারীকে খাওয়ানোর প্রতি উৎসাহী করা এবং খাবারের প্রতি বেশি খেয়ালি না হওয়ার শিক্ষা দেওয়া এবং ১৩) যেকোনো হালাল খাদ্যে সন্তুষ্ট থাকার শিক্ষা দেওয়া।

পোশাক সম্পর্কে শিক্ষাদান

ছেলে শিশুকে রঙিন, রেশম কাপড়ের বিপরীতে সাদা পোশাক পছন্দকারী হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। এ ব্যাপারে তাকে বলতে হবে, এগুলো হচ্ছে মহিলা এবং মেয়েলি স্বভাবজাত কাপড় আর এ ধরনের পোশাক পুরুষস্বভাবের বিরুদ্ধ। এমন নির্দেশনা তাকে বারবার দিতে হবে। যখনই কোনো শিশুকে এমন রঙিন আর রেশমি কাপড় পরিধান করতে দেখবে, তখন তাকে এর নিন্দনীয়তা এবং এটা যে তার জন্য অনুচিত– তা বলতে হবে।

অসৎ সঙ্গ থেকে দূরে রাখা

শিশুকে উচ্চাবিলাসী, অতিউৎসাহী এবং অহংকারী মেজাজের পোশাক পরিধানকারী শিশু থেকে নিরাপদ রাখতে হবে। সাথে এমন মানুষ থেকেও দূরে রাখতে হবে, যারা এই স্বভাবের গল্প করে এবং সেদিকে প্ররোচিত

করে। কারণ যখনই কোনো শিশুকে তার বেড়ে ওঠার সময় চরিত্র গঠনের বিষয়ে খামখেয়ালিপনা দেখানো হবে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে সে উত্তম শিষ্টাচারের চাদর থেকে বের হয়ে মিথ্যা, হিংসা, চুরি, পরনিন্দা, হাসি-তামাশা, প্রতারণা ও অশালীন ইত্যাদি খারাপ আচরণে অভ্যস্ত হয়ে যাবে। এসব মন্দাভ্যাস থেকে দূরে রাখা যায় কেবল উত্তম আদব শিক্ষাদানের মাধ্যমে।

শিশুকে মক্তবে শিক্ষাদান

শিশুকে মক্তবে জ্ঞান আহরণে নিয়োজিত রাখতে হবে। সে সেখানে ধারাবাহিক কুরআন, হাদীস, ইতিহাস এবং তার নিষ্পাপ মনে নেককারদের ভালোবাসার বীজ বপনে বুযুর্গদের জীবনাচরণ ও জীবনবোধ শিক্ষা নিবে। শিশুকে নাজায়িয প্রেমকাব্য এবং এতে আসক্ত ব্যক্তি থেকে দূরে রাখতে হবে। এবং সে ধরনের লেখক-সাহিত্যিকের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া থেকে বিরত রাখতে হবে, যারা এমন অবৈধ প্রেমকে সময়ের চাহিদা ও স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য বলে থাকে। কারণ এতে শিশুর অন্তরে ফাসাদের বীজ বপন হয়।

উৎসাহ প্রদান ও ভুল সংশোধনের পন্থা

শিশুর মাঝে উত্তম চরিত্র এবং প্রসংশনীয় কার্য প্রকাশিত হলে শিশুর এই উত্তম কাজের জন্য সম্মানিত করা, তাকে এমন উপহার প্রদান করা যাতে সে খুশি হয়। লোক সমাগমে তার ভালো কাজের প্রসংশা করা। আর যদি সে চেষ্টায় থাকা সত্ত্বেও কখনও একবার খিলাফ হয়ে থাকে, তাহলে উচিত হল অনাকাঙ্ক্ষিত কাজের বিষয় এড়িয়ে যাওয়া। তার এই গোপন দোষের ছিদ্রান্বেষণ এবং তা প্রকাশ করা উচিত হবে না, বিশেষত: শিশু যদি তা গোপন রাখতে চায় এবং তা ঢেকে রাখতে চেষ্টা করে। কারণ যদি তা প্রকাশ করা হয় তাহলে সে এ কাজটি আরও করার সাহস পাবে এমনকি ফলশ্রুতিতে পরবর্তিতে এই ভুল কাজটি প্রকাশ্যে আসা না আসা নিয়ে সে কোনো ভ্রুক্ষেপ করবে না। তাই প্রথমবার এমন হলে তা প্রকাশ না করা এবং দ্বিতীয়বার তা করলে তাকে একান্তে ভুল ধরে সংশোধন করে দেওয়া উচিত এবং এটি যে বড় অপরাধ তা তুলে ধরা উচিত। তাকে বলবে, সাবধান, এ কাজ থেকে তোমাকে বিরত থাকতে হবে, যদি তা প্রকাশ পায় তাহলে মানুষের কাছে তুমি তিরস্কৃত হবে। সবসময় তাকে শাসানো উচিত নয়। কেননা এমনটা করা হলে তার কাছে শাসন হালকা হয়ে ওঠবে। তার কাছে শাসনমূলক কথার মূল্যায়ন থাকবে না। পিতা সন্তানের সাথে কথা বলার সময় স্বীয় মর্যাদা ধরে রাখবেন, সবসময় ধমকানি না দিয়ে প্রয়োজনমত শাসন করবেন। মা সন্তানকে বাবার শাসনের ব্যাপারে ভয় দেখিয়ে রাখবেন যে, ভুল হলে বাবা শাসন করবেন এবং মন্দ কাজ থেকে সন্তানকে বাঁচিয়ে রাখবেন।

ঘুমের ক্ষেত্রে সতর্কতা এবং আলসেমি থেকে দূরে রাখা

শৈশবের শেষ থেকেই সন্তানকে দিনের বেলা ঘুমাতে নিষেধ করা উচিত। এই অভ্যাস তাকে অলসতার উত্তরাধিকারী বানিয়ে দিবে। আর রাতে ঘুমানোর ব্যাপারেও কোনো প্রতিবন্ধকতা না রাখা। তবে তাকে বড়, নরম বিছানা দিবে না, যাতে তার হাড্ডি শক্তপোক্ত হয় এবং শরীরে চর্বি না জমে। সে এসব আরাম আয়েশ সহসাই ত্যাগ করতে পারবে না, বরং তাকে শক্ত বিছানা, শালীন কাপড়, নিয়ন্ত্রিত খাবার গ্রহণে অভ্যস্ত করা লাগবে। সন্তানের ক্ষেত্রে আরেকটি উচিত কাজ হলো, তাকে প্রত্যেকটি কাজ গোপনে না করে প্রকাশ্যে বা অবগতিতে করার শিক্ষা দেওয়া। কারণ সে তো এমন কাজই গোপন করে, যা সে নিন্দনীয় মনে করে। এভাবে প্রত্যেকটি কাজ প্রকাশ্যে করায় সে প্রকাশ্যে মন্দ কাজ না করায় অভ্যস্ত হয়ে যাবে। সন্তানকে দিনের কিছু সময় হাঁটাচলা, কায়িক শ্রম, ব্যায়াম করাতে হবে। এসব কাজে অভ্যস্ত করালে অলসতা তার উপর চেপে বসতে পারবে না।

(পরবর্তী সংখ্যায় সমাপ্য)

সূত্র:

ইমাম গাযালী রাহিমাহুল্লাহ'র কালজয়ী 'ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন' কিতাবের 'রুবউল আদাত' অধ্যায়ের 'রিয়াদাতুন নাফস ওয়া তাহযীবুল আখলাক' পরিচ্ছেদের 'বাইয়ানুত তারিক ফী রিয়াদাতিস সিবইয়ান ফী আউয়ালি নাশওয়িহিম ওয়া ওয়াজহু তাদীবিহিম ওয়া তাহসীনি আখলাকিহিম' পাঠের অনুবাদ।

[১] সূরা তাহরীম- ৬



ট্রাম্পের বিজয় ও চতুর্ধা বিভক্ত মুসলিম ভোটার

মুহাম্মাদ বিন নূর



দুনিয়াজুড়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের দোর্দণ্ড প্রতাপের এই যুগে দেশটির প্রেসিডেন্ট নির্বাচন এমনিতেই পুরো পৃথিবীর জন্যে জরুরি, নানা কারণে এ বছরের নির্বাচন আরো বেশি গুরুত্ব পেয়েছে, দেশটির ভিতরে ও বাইরে। মার্কিন প্রথা মাফিক সাধারণত নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট পরের নির্বাচনে আবার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চাইলে তার দলের কেউ সামনে আসেন না , তবে প্রেসিডেন্ট নিজে তার দ্বিতীয় দফা নির্বাচনে জিততে না পারলে এর পর আর সাধারণত নির্বাচনমুখী হন না, যদিও এসব ক্ষেত্রে আইনি বাঁধা নেই। এবারের নির্বাচনে উভয় প্রথাই খানিকটা ভেঙেছে, ট্রাম্প এর আগে প্রথম দফায় দায়িত্বপালন শেষে দ্বিতীয় দফায় পরাজিত হয়েও এবার আবার প্রথা ভেঙে দাঁড়িয়েছেন, আবার জো বাইডেন প্রথা মাফিক দ্বিতীয় দফায় বিনা বাঁধায় প্রার্থী হতে পারলেও শেষ পর্যন্ত দৌড়ে টিকে থাকতে পারেননি, সরে দাঁড়িয়েছেন– নিজের রানিংমেট কমলা হ্যারিসকে সমর্থন দিয়ে।

এবারের নির্বাচনে বেশ কিছু আভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক ইস্যু গুরুত্ব পেলেও সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পাচ্ছিল এক বছর ধরে চলমান গাযায় ইসরায়েলী গণহত্যা। বাইডেন কেবল মুসলিমদের চোখেই গণহত্যার সহযোগী হিসেবে অপরাধী ছিলেন না, বরং ধর্ম নির্বিশেষে তরুণ মার্কিনদের নিকট এই প্রশ্নে তিনি গ্রহণযোগ্যতা হারিয়েছিলেন। বাইডেনের জন্য তাই এই নির্বাচন জেতা অসম্ভব মনে হচ্ছিল, ভারতীয়-আফ্রিকান বংশোদ্ভুত কমলা হ্যারিস প্রার্থী হওয়াতে ডেমক্রেটদের প্রত্যাশার পারদ খানিকটা উর্ধ্বমুখী হয়েছিল বটে, কিন্তু তিনি নিজেই বাইডেনের সকল নীতি অব্যাহত রাখার ঘোষণা দিয়ে এবং যথাসম্ভব মিশিগানসহ অন্যান্য মুসলিম অধ্যুষিত অঙ্গরাজ্যে মুসলিম নেতাদের থেকে দূরত্ব এবং ইসরায়েলপন্থীদের নিয়ে ক্যাম্পেইন চালিয়ে সে আশার গুড়েবালি ঢেলেছেন। যুক্তরাষ্ট্রের আরব-মুসলিমদের রাজধানীখ্যাত মিশিগানের ডিয়ারবন শহরে হ্যারিক কোন মুসলিম নেতার সাথে সাক্ষাৎ না করলেও, এমনকি মুসলিম ইমামদের অনুরোধ সত্ত্বেও সাক্ষাৎ না করলেও, মুসলিম বিরোধী প্রার্থী ট্রাম্প আরব-মুসলিম ইমামদের সাথে সাক্ষাৎ করেন, এমনকি কয়েক জনের প্রকাশ্য সমর্থন আদায়েও সক্ষম হন।

সব মিলিয়ে নির্বাচনে মুসলিম ভোটাররা মোটা দাগে চার ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েন, একদল ঐতিহ্যগতভাবে ডেমক্রেটপ্রার্থীকেই ভোট দিয়েছিলেন, তাদের মতে মুসলিমদের জন্য ট্রাম্প আরো ভয়াবহ হবেন, তাই ডেমক্রেটরা ইসরায়েলকে যত নিঃশর্ত সমর্থনই দিক তাদেরকেই ভোট দিতে হবে। আরেক দল তৃতীয় বৃহত্তম দল তথা গ্রিন পার্টিকে ভোট দিয়েছিলেন, গ্রিন পার্টি জিতবে না জেনেও ভোট দিয়েছিলেন মূলত ডেমক্রেটদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের অংশ হিসেবে। গ্রিন পার্টির ফিলিস্তিন প্রশ্নে খুব স্পষ্ট অবস্থান, ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে আফ্রিকান-মুসলিম অধ্যাপককে মনোনয় প্রদান এক্ষেত্রে ভূমিকা রেখেছে বলেও মনে করা হয়। সার্বিকভাবে গ্রিন পার্টি ভোটের মাঠে দাগ কাটতে ব্যর্থ হলেও মুসলিমদের মধ্যে এবার তারা ব্যাপক সাড়া ফেলেছিল। আরেক দল মুসলিম ভোটার ভোট দান থেকে বিরত ছিলেন, কারণ তাদের মতে জয়ী হওয়ার উপযুক্ত কোন প্রার্থীই মুসলিমদের ভোট অর্জন করার মতো কোন অবস্থান গ্রহণ করেননি। সবচেয়ে বিস্ময়কর বিষয় হলো, সংখ্যায় কম হলেও একদল মুসলিম এবার সরাসরি ডোনাল্ড ট্রাম্পের মতো উগ্র মুসলিম বিদ্বেষী প্রার্থীকে ভোট দিয়েছিলেন, এমনকি ইয়ামানী এক ইমামের নেতৃত্বে কয়েক জন ইমাম মিশিগানে প্রকাশ্যে ট্রাম্পের পক্ষে তাদের সমর্থন ব্যক্ত করেছিলেন। তাদের ধারণা, ট্রাম্প নীতিগতভাবে যুদ্ধবিরোধী, এইবারও তাদের নিকট ট্রাম্প প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তিনি নির্বাচিত হলে গাযায় যুদ্ধ বন্ধ করবেন তাৎক্ষণিক, আর এবার যেহেতু তাদের নিকট প্রধান এজেন্ডা ফিলিস্তিন, তাই তারা সব ভুলে ট্রাম্পকেই নির্বাচিত করেছেন।

নভেম্বরে নির্বাচন শেষ হয়েছে, কিন্তু ট্রাম্প কুরসীতে বসবেন জানুয়ারিতে । ট্রাম্প আসলে কী করবেন, তা জানতে ততদিন অপেক্ষা করতে হবে। তবে একথা সত্য, ট্রাম্প নীতিগতভাবে যুক্তরাষ্ট্রের বাইরের যে কোন বিষয়ে যথাসম্ভব কম অর্থ ব্যয় করতে আগ্রহী, তাই ইউক্রেন কিংবা ইসরায়েল কাউকেই তিনি দীর্ঘমেয়াদে যুদ্ধ চালাতে সহযোগিতা করতে আগ্রহী হবেন না– এ কথা বলাই যায়। কিন্তু মুশকিল হলো, তার সে চাওয়া কি আদৌ ফিলিস্তিনিদের পক্ষে কাজে লাগবে? ট্রাম্প তার আগের মেয়াদে কথিত 'শতাব্দীর সেরা চুক্তি'র মাধ্যমে ইসরায়েল-ফিলিস্তিন সংঘাত শেষ করতে চেয়েছিলেন, যে চুক্তির আওতায় সব ধরনের আন্তর্জাতিক আইনে অবৈধ ইসরায়েলী বসতিগুলোকেও বৈধতা দেওয়ার প্রস্তাবনা ছিল। তিনি পবিত্র আল কুদস তথা জেরুযালেমকে ইসরায়েলের রাজধানীর স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। ফলে তিনি দায়িত্বগ্রহণের পর যুদ্ধ থামাতে চাইবেন সত্যি, কিন্তু তার বিনিময়ে এবার হয়তো আরো বেশি ফিলিস্তিনী অঞ্চলকে ইসরায়েলের হাতে তুলে দেওয়ার চেষ্টা করবেন। এক কথায়, ইসরায়েল যুদ্ধের মাধ্যমে যা যা করতে চায়, তিনি

তার সবকিছু নিশ্চিত করে যুদ্ধ থামিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করার সম্ভাবনাই বেশি।

এই পরিস্থিতিতে আরব রাষ্ট্রগুলোর শক্তিশালী ভূমিকা না থাকলে ফিলিস্তিনীদের জন্য ট্রাম্পের আগামী মেয়াদ ভয়াবহ আকার ধারণ করতে পারে। পুরো গাযা, আল কুদস এবং পশ্চিম তীরের উল্লেখযোগ্য অংশকে সরাসরি ইসরায়েলের হাতে তুলে দিয়ে ফিলিস্তিনীদের উচ্ছেদের মাধ্য ট্রাম্প যে ধরনের শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে চাইবেন, তার বিরুদ্ধে কথা বলার মতো অবস্থান কেবল আরব রাষ্ট্রগুলোর রয়েছে। এক্ষেত্রে সৌদি-আমিরাতের মতো দেশগুলোর সত্যিকারের অবস্থান আশঙ্কাজনক বটে। গত সাত অক্টোবরের পর থেকে এই দুটি দেশের গণমাধ্যম বলতে গেলে প্রকাশ্যে প্রতিরোধযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে এবং ইসরায়েলের পক্ষে প্রোপাগান্ডা চালিয়ে আসছে। জনমতের চাপে বাধ্য হয়ে সৌদি আরব ইসরায়েলের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের কার্যক্রম আপাতত স্থগিত করলেও ট্রাম্পের চাপে তারা শেষ পর্যন্ত কোন অবস্থান গ্রহণ করবে, তা বলা কঠিন। তবে সৌদি আরব বিভিন্ন কারণে মধ্যপ্রাচ্যে শুধু আমেরিকার উপর নির্ভরশীল না থেকে ইরানসহ অন্যান্য আঞ্চলিক শক্তিসমূহের সাথে যেভাবে সম্পর্ক উন্নয়ন করছে, তার সাথে সৌদি তথা মুসলিম বিশ্বের জনমত বিবেচনায় বলা যেতে পারে, ক্ষীণ সম্ভাবনা রয়েছে ট্রাম্পের ইসরায়েলপন্থী পরিকল্পনার বিরুদ্ধে সৌদি আরব অবস্থান গ্রহণ করতেও পারে। অন্যথায় ফিলিস্তিনের প্রতিরোধযোদ্ধাদের জন্য কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হবে ট্রাম্পের আমলে।

ডেমক্রেটরা নির্বাচনে হারার পর কিছুটা কাকতালীয়ভাবেই বলা চলে, নভেম্বরের শেষ দিকে লেবাননের হিযবুল্লাহ এবং ইসরায়েলের মধ্যে যুদ্ধবিরতি হয়েছে বাইডেন প্রশাসনের হাত ধরেই। তবে এক্ষেত্রে ফ্রান্সের ভূমিকা অগ্রগণ্য ছিল বলে ধারণা করা হচ্ছে। লেবাননে উন্মুক্ত যুদ্ধ শুরুর পর থেকেই ফ্রান্স যুদ্ধবিরতি বাস্তবায়নে জোর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল, সেই প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে শেষ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্সের মধ্যস্থতায় যুদ্ধবিরতি নিশ্চিত হয়। যুদ্ধবিরতি নিশ্চিত হলেও উভয়পক্ষের সৈন্য প্রত্যাহারের জন্য ৬০ দিন সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছে এবং ইসরায়েলের গণমাধ্যমে প্রকাশিত বিভিন্ন খবরের আলোকে জানা যাচ্ছে, ইসরায়েল তাদের আভ্যন্তরীণ গণমাধ্যমে এখনো বলছে যে তারা লেবাননের অভ্যন্তর থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করবে না। এদিকে ৬০ দিন পূর্ণ হওয়ার আগেই ট্রাম্প ক্ষমতায় চলে আসবেন, তাতে এই চুক্তির ভাগ্যে কী ঘটে, তাও লক্ষণীয় বটে। বাইডেন প্রশাসন শেষ মুহূর্তে লেবাননের মতো গাযায়ও কোন যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষরের চেষ্টা করবেন কিনা, তা সময়ই বলে দেবে। তবে গাযায় দীর্ঘস্থায়ী সমাধানের পূর্বেই যেহেতু ট্রাম্পের সিংহাসনে আরোহণ নিশ্চিত, ফলে এক্ষেত্রে ট্রাম্পের নীতিই এখন সবচেয়ে বড় চিন্তার বিষয়। তদুপরি ট্রাম্প ইতোমধ্যে তার প্রশাসনে যাদেরকে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ প্রদানের ঘোষণা দিয়েছেন, তারাও ভয়ঙ্কর জায়নবাদী বলে পরিচিত। ট্রাম্পের জয়ী হওয়ার ফলে যুদ্ধবিরতির চেয়ে ফিলিস্তিনের ভবিষ্যত নিয়ে আরো অনেক চিন্তার উদ্রেক হচ্ছে, তা বলাই বাহুল্য।

ট্রাম্প যে শুধু ফিলিস্তিন ইস্যুতেই দুশ্চিন্তার কারণ, তা কিন্তু নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত মুসলিম, আরব, আফ্রিকানসহ অশ্বেতাঙ্গদের জন্যও তার অনেক নীতি হতে পারে বেশ ভয়াবহ। উগ্র শ্বেত শ্রেষ্ঠত্ববাদের জন্য কুখ্যাত ট্রাম্পের শাসনকাল তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভিতরে এবং বাইরে সর্বত্র বহু আশঙ্কার জন্ম দেয়, সে সব আশঙ্কাকে নেহাতই উড়িয়ে দেওয়ার সুযোগ নেই।



এই মাসে এই চাঁদে



মাওলানা খালেদ সাইফুল্লাহ সিদ্দিকী

আমীনুর রশীদ এর খিলাফত লাভ

আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ আল আমীন ছিলেন পঞ্চম আব্বাসীয় খলীফা হারুনুর রশীদ ও যুবাইদা বিনতে জাফর মনসুরের পুত্র। তিনি মাতৃকুল ও পিতৃকুল থেকে হাশেমী বংশের ছিলেন। হিজরী ১৭০ সালে আমীন জন্মগ্রহণ করেন। ইমাম কিসায়ীর নিকট তিনি অধ্যয়ন করেন। ইমাম মালিক (র.)- এর নিকটও তিনি অধ্যয়ন করে নাহু (ব্যাকরণ), সাহিত্য ও ফিকহ শাস্ত্রে পারদর্শিতা অর্জন করেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সুন্দর, মেধাবী, বাগ্মী, বক্তা। অতি আরাম-আয়েসে তিনি লালিত-পালিত হন।

আমীন ছিলেন হারুনুর রশীদ ও যুবাইদার অতি আদরের পুত্র। হিজরী ১৭৫ সালে তাঁর তিন পুত্র-আমীন, মামুন ও কাসিম মুতামিনকে পরপর উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। অবশ্য মুতাসিম পড়ালেখায় অনগ্রসর হওয়ায় তাকে বঞ্চিত করা হলেও পরবর্তীকালে মুতাসিমই প্রভাবশালী খলীফা হন এবং তারই বংশে অধিকাংশ খলীফা হন। হারুনুর রশীদ প্রথমোক্ত তিন পুত্রকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করে তাদের মধ্যে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব ভাগ করে দেন এবং তাদেরকে নির্দিষ্ট এলাকার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। তাঁর শেষ জীবনের এই ব্যবস্থানুযায়ী মামুনকে খোরাসান ও পূর্বাঞ্চলের স্থায়ী শাসনকর্তা এবং তার রাজধানী মার্ব (মারো) স্থির করা হয়। পশ্চিম এলাকার শাসনকর্তা হন কাসিম। আবূ বাগদাদ ইরাকাইন-এর শাসনকর্তা এবং খলীফা হিসেবে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করেন আমীনকে। এতদসংক্রান্ত একটি অঙ্গীকারনামাও রচিত হয়। খলীফা হারুনুর রশীদ ইন্তিকালের পূর্বে হিজরী ১৯৩ সালে রাফি ইবন লাইসের বিদ্রোহ দমনের উদ্দেশ্যে খোরাসান গমনকালে আমীনকে তাঁর প্রতিনিধি করে যান। খোরাসান অভিযানে মামুনও সঙ্গে ছিলেন। পথে তুস নামক স্থানে হারুন অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং সেখানেই তিনি ৪৭ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। হারুনের ইন্তিকালের বেশ কিছুদিন পর যুবরাজ আমীন পিতার মনোনীত উত্তরাধিকারী খলীফা হন। হারুনের সেক্রেটারী ফযল ইবন রণী আমীর-ওমরা ও মন্ত্রীবর্গসহ বাগদাদে গিয়ে তাঁর হাতে বাইআত গ্রহণ করেন। মামুন ছিলেন তখন মার্কে।

রাফি ইবন লাইস খলীফা হারুনের আমলেই বিদ্রোহ করছিলেন এবং তার বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে পথিমধ্যে হারুন ইন্তিকাল করেন, যা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। হারুনের ওফাতের পর রাফির বিদ্রোহ আরও তীব্র আকার ধারণ করে এবং তার উৎপাত ব্যাপকভাবে এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে । আমীন হারস্থামাকে প্রেরণ করে এই বিদ্রোহ দমন করেন। অতঃপর আমীন ও মামুনের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয় এবং এই বিরোধ তীব্রতর হয়ে উঠে। আমীন অঙ্গীকারও ভঙ্গ করে মামুনের পরিবর্তে স্বীয় পুত্র মূসাকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন এবং মামুনের নাম খুতবা হতে বাদ দিয়ে দেন। মামুন খবর পেয়ে আমীনের নামও খুতবা হতে বাদ দিয়ে দেন। এই বিরোধের পরিণতিতে আমীন ও মামুনের মধ্যে যুদ্ধ বাধে এবং এই যুদ্ধে আমীন নিহত হন। আমীনুর রশীদ হিজরী ১৯৩/৮০৯ সালের ১৮ জমাদিউস সানী খিলাফত লাভ করেন।

সুলতান ইবরাহীম ইবন আদহাম (র.) এর ইন্তিকাল

বলখের রাজবংশের একজন সুলতান এক গাইবী আওয়াজে কিংবা হারানো উটের এক অনুসন্ধানীর উক্তি শ্রবণ করে রাজসিংহাসন ত্যাগ করতঃ রূহানী জগতের সম্রাট হয়েছিলেন। তাঁর নাম হযরত খাযা ইবরাহীম ইবন আদহাম (র.)। তাঁর জীবনকাল নির্ণয়ে জীবনী লেখকগণের মধ্যে তীব্র মতভেদ পরিলক্ষিত হলেও রাজসিংহাসন ত্যাগ করে তিনি আল্লাহর পথে জীবন উৎসর্গ করে তাঁর প্রিয় বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন, এ সম্পর্কে কারো দ্বিমত নেই। তিনি কতদিন বলখের সুলতান হিসেবে রাজত্ব করেন তার সঠিক বিবরণ অজ্ঞাত। তবে কারো কারো মতে তিনি বলখের শাহজাদা বা যুবরাজ থাকা অবস্থায় তাঁর জীবনধারায় আমূল পরিবর্তন ঘটে। কোন জীবনী গ্রন্থে খাযা ইবরাহীম ইবন আদহাম (র.) এর বংশ তালিকা নিম্নরূপ প্রদত্ত হয়েছে।

কুনিয়াত আবূ ইসহাক। বংশধারা ইবরাহীম ইবন আদহাম ইবন সুলাইমান, ইবন মনসুর ইবন নাসির বলখী, ফারুকী। বলখের রাজপরিবারে জন্মগ্রহণকারী এই কৃতিসন্তান উত্তম শিক্ষা-দীক্ষা লাভ করে তাঁর পৈতৃক রাজত্বে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। তাঁর সংসার সিংহাসন ত্যাগ সম্পর্কে হযরত আলী আল হুজাইরী (দাতা গঞ্জে বখশ র.) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'কাশফুল মাহযুবে' লিখেছেন, প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন বলখের একজন শাহজাদা। একদিন শিকারে গিয়ে একটি হরিণের অনুসরণ করতে করতে তিনি স্বীয় অনুচরগণের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। এ সময়ে আল্লাহর কুদরতে হরিণটি মানুষের মতো ভাষায় তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠে- 'এরূপ কাজের জন্যই কি তোমার জন্ম হয়েছে, আর তোমাকে কি এ ধরনের কাজ করতে বলা হয়েছে?' হরিণের মুখে এরূপ মানুষের মতো কথা বলতে শুনে তাঁর মনে বিরাট প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হলো। অতঃপর সর্বস্ব ত্যাগ করে তিনি বিরাগীর জীবন গ্রহণ করলেন। তিনি সুফইয়ান সাওরীর নিকট তাসাওউফতত্ত্বেও শিক্ষা গ্রহণ করেন। সুলতান ইবরাহীম ইবন আদহাম (র.) এর রাজত্ব পরিত্যাগ করার আরও ঘটনা ইতিহাসে বর্ণিত হয়েছে। কথিত আছে যে, তিনি হযরত ইমাম আযম আবূ হানীফা (র.)- এর নিকট দ্বীনী শিক্ষা লাভ করেছিলেন এবং ইমাম সাহেব তাঁকে 'সায়্যিদুনা ইবরাহীম' উপাধি দেন। একবার ইমাম আযম বলেন, ইবরাহীম ইবন আদহাম সর্বদা আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাকেন এবং আমি নিজের কাজে ব্যস্ত থাকি। হযরত যুনাইদ বাগদাদী (র.) তাঁকে "মাফাতীহুল উলূম" উপাধিতে ভূষিত করেন। হযরত খাযা ফুযাইল ইবন আয়াদ (র.) তাঁর পীর-মুরশিদ ছিলেন এবং তাঁর কাছ থেকে তিনি খিলাফত লাভ করেন। হযরত ইমাম বাকির (র.)ও তাঁকে খিলাফত দান করেন। তিনি দীর্ঘ সফর করেন। তিনি নিশাপুরের এক গুহায় ৯ বছর সাধনা করেন এবং মদীনা মুনাওয়ারায়ও কিছুকাল অবস্থান করেন। তিনি বহু অলৌকিক ঘটনার অধিকারী। তাঁর ইন্তিকালের তারিখ সম্বন্ধে বহু মতভেদ রয়েছে। কারো কারো মতে তাঁর বয়স হয়েছিল ১২০ বছর। একটি মত অনুযায়ী- তিনি হিজরী ২২৬ সালের ২১ জমাদিউস সানী সিরিয়ায় ইন্তিকাল করেন।

জীবন জিজ্ঞাসা

জবাব দিচ্ছেন-

মাওলানা আবূ নছর মোহাম্মদ কুতুবুজ্জামান তাফাদার

প্রিন্সিপাল ও খতীব, আল ইসলাহ ইসলামিক সেন্টার

মিশিগান, আমেরিকা

প্রশ্ন: শুধু জুমুআবার রোযা রাখা যাবে কি?

জবাব: সুনির্দিষ্টভাবে কেবল শুক্রবারে নফল রোযা রাখা সম্পর্কে ফকীহগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। কারো মতে মুস্তাহাব, আবার কারো মতে ইহা মাকরূহ। হানাফী মাযহাবে এ বিষয়ে দুটি মত রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) এর মতে জায়িয বরং মুস্তাহাব। অনুরূপ ইমাম মালিক (র.) এর মতে ইহা মুস্তাহাব।

تحفة الفقهاء ١/ ٤٤٣، الفتاوى التارخانية ٢/ ٩٨٣، حاشية الشلبي ١/ ٢٣٣، الشرح الكبير للدردير ١/ ٤٣٥، حاشية الدسوقي ١/ ٤٣٥، جواهر الإكليل ١/

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) এর মতে ইহা মাকরূহ। অনুরূপ ইমাম শাফিঈ (র.) ও ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (র.) এর মতে ইহা মাকরূহ।

الفتاوى التارخانية ٢/ ٩٨٣، حاشية الشلبي ١/ ٢٣٣، المنهاج ١/ ٥٣٥، مغني المحتاج ١/ ٦٤٤، غاية المنتهى ٢/ ٩١٢، التسهيل ص ٠٩.

হাদীস শরীফে এসেছে, রাসূল ﷺ শুধু শুক্রবার বা শনিবার রোযা রাখাকে অপছন্দ করতেন। তাই এ সম্পর্কে হাদীস শরীফে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। সহীহ মুসলিমের হাদীসে এসেছে-

عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلم: "لَا يَصُمْ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. إِلَّا أَنْ يَصُومَ قَبْلَهُ أَوْ يَصُومَ بعده"

-রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমাদের কেউ জুমুআর আগে অথবা পরে কোন রোযা মিলিয়ে না রেখে শুধু জুমুআর দিন যেন রোযা না রাখে। (সহীহ মুসলিম, হাদীস-১১৪৪; بَاب كَرَاهَةِ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ مُنْفَرِدًا)

সুনান আবূ দাউদে এসেছে-

عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلم: "لا يَصُمْ أحدُكُم يومَ الجمعةِ، إلا أن يَصُومَ قبلَه بيومٍ أو بعدَهُ"

-রাসূল ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ জুমুআর আগে অথবা পরে একদিন মিলানো ব্যতীত শুধু জুমুআর দিন রোযা রেখো না। (সুনান আবূ দাউদ, হাদীস-২৪২০; باب النهي أن يُخَصَّ يومُ الجمعة بصومٍ)

ফাতহুল কাদীর কিতাবে লিখেছেন-

وَلَا بَأْسَ بِصَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ مُنْفَرِدًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ.

(ফাতহুল কাদীর, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৫০)

মিনহাতুস সুলূক কিতাবে লিখেছেন-

قوله: (والجمعة) أي يستحب صوم يوم الجمعة، قال في الإيضاح: لا بأس بصوم يوم الجمعة في قول أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف: قد جاء حديث في كراهته، غلا أن يصوم قبله يوماً أو بعده يوماً، وهو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا يصم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله بيوم أو بعده" رواه مسلم وأبو داود

(মিনহাতুস সুলূক, পৃষ্ঠা-২৭৯)

যে সকল হাদীসে এককভাবে জুমুআর দিনে নফল রোযা রাখা নিষেধ করা হয়েছে, সে সকল হাদীসের জবাবে লিখেছেন-

وأجاب الدسوقي عن أحاديث النهي بأنها محمولة على زمنه صلى الله عليه وسلم لاحتمال الفرضية. (انظر: "الشرح الكبير" ١/ ٤٣٥(

দাসূকী এর জবাবে বলেছেন, নিষেধ করা হয়েছিল শুধু রাসূল ﷺ এর যুগে তা ফরয হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকায়। (আশ শারহুল কাবীর, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৫৩৪)

নিষেধ করার কারণ সম্পর্কে কেউ কেউ বলেছেন-

لأن فيه وظائف، فلعله إذا صام ضعف عن فعلها

(রদ্দুল মুহতার, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৭৫)

জুমুআর দিনে করণীয় বহু আমল রয়েছে, রোযা রাখলে শারীরিক দুর্বলতা সৃষ্টি হওয়ার কারণে সে সকল আমলে ব্যাঘাত হওয়ার আশঙ্কায় নিষেধ করা হয়েছে।

ইমাম মালিক (র.) বলেন,

قال مالك: لم أسمع أحدًا ممن يقتدى به ينهى عنه.

আমি অনুসরণযোগ্য কাউকে জুমুআর দিনে রোযা রাখার বিষয়ে নিষেধ করতে শুনিনি। (বযলুল মাজহুদ, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৬১৪)

এ সম্পর্কে বযলুল মাজহুদ কিতাবে আরো লিখেছেন-

وذكر في "الدر المختار" في المندوب صومَ يوم الجمعة ولو منفردًا، قال الشامي صرح به في "النهر"، وكذا في "البحر" فقال: إن صومه بانفراده مستحب عند العامة كالاثنين والخميس، وكره الكل بعضهم، فما في "الأشباه" وتبعه في "نور الإيضاح" من كراهة إفراده بالصوم قول البعض، وفي "الخانية" ولا بأس بصوم يوم الجمعة عند أبي حنيفة ومحمد لما روي عن ابن عباس أنه كان يصومه ولا يفطر، وفي "التجنيس": قال أبو يوسف: جاء حديث في كراهته إلَّا أن يصوم قبله أو بعده، فكان الاحتياط أن يضم إليه يومًا آخر، انتهى.

(বযলুল মাজহুদ, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৬১৫)

মোটকথা জুমুআর দিন নফল রোযা রাখা এককভাবে হলেও মাকরূহ নয় । বরং হানাফী ফকীহগণের অধিকাংশের মতানুযায়ী মুস্তাহাব। তবে এর আগে বা পরে অন্য দিন রাখলে তা উত্তম।

হাফিজুর রহমান

কুলাউড়া, মৌলভীবাজার

প্রশ্ন: মসজিদে ইমামের জায়নামায মসজিদের ঠিক মাঝামাঝি রাখা জরুরি কি না? দলীলসহ জানতে চাই।

জবাব: মসজিদে ইমামের দাঁড়ানো সামনের কাতারের ঠিক মধ্যস্থলের বরাবর সামনে হওয়া সুন্নাত। সে হিসেবে জায়নামায ঠিক মাঝামাঝি রাখা সুন্নাত। এর পরিপন্থি ডানে বা বামে সরিয়ে স্থাপন মাকরূহ। এ সম্পর্কে সুনান আবূ দাউদের হাদীসে হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে-

عن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : وَسِّطوا الإمامَ، وسُدُّوا الخَلَلَ

-রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমরা (জামাতে নামাযে) ইমামকে মাঝামাঝি স্থানে রাখো এবং কাতারের মধ্যবর্তী ফাঁকা পূর্ণ করো। (সুনান আবূ দাউদ, হাদীস-৬৮১)

বাযলুল মাজহুদ কিতাবে এর ব্যাখ্যায় লিখেছেন-

(وسطوا الإمام) أي اجعلوا إمامكم بأن تصفوا خلفه بحيث يكون الإمام حذاء

وسط الصف، ويكون من عن يمينه من الرجال ومن عن يساره سواء

-'ইমামকে মাঝামাঝি স্থানে রাখো' এর মর্মার্থ হচ্ছে- ইমামকে এমন স্থানে রাখবে যেন তোমরা তার পিছনে কাতারে দাঁড়ালে তিনি তোমাদের কাতারের মধ্যস্থলের বরাবর সামনে হোন এবং ডান ও বাম পাশের লোক সংখ্যা সমান হয়। (বাযলুল মাজহুদ, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৬৩১)

রদ্দুল মুহতার কিতাবে লিখেছেন-

السُّنَّةُ أَنْ يَقُومَ فِي الْمِحْرَابِ لِيَعْتَدِلَ الطَّرَفَانِ، وَلَوْ قَامَ فِي أَحَدِ جَانِبَيْ الصَّفِّ يُكْرَهُ،

-সুন্নাত হচ্ছে- ইমাম মিহরাবের মধ্যস্থানে দাঁড়ানো, যাতে কাতারের উভয়পার্শ্ব সমান হয়। আর ইমাম কাতারের যেকোনো পার্শ্বে সরে দাঁড়ালে তা মাকরূহ। (রদ্দুল মুহতার, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৫৬৮)

মুদ্দাসসির আলী
হাউসা, সদর, সিলেট

প্রশ্ন: মসজিদে আযান হওয়ার পর কেউ জামাআতের অপেক্ষা না করে নিজে নামায আদায় করে চলে যেতে পারবে কি? শরীআতের বিধান কী?

জবাব: মসজিদে আযান হওয়ার পর বিশেষ কোন প্রয়োজন ব্যতীত কেউ জামাআতের অপেক্ষা না করে নিজে নামায আদায় করে চলে যাওয়া মাকরূহ। বিশেষ প্রয়োজন বলতে যদি সে অন্য মসজিদে নামাযের ইমামতী করতে হয় কিংবা সে সময়ে অন্যত্র তার পূর্ব নির্ধারিত কোন জরুরি প্রয়োজন সমাধা করা আবশ্যক হয়, কিংবা এরূপ কোন বিষয়ের সম্মুখীন হয়। আর কেউ যদি ফিরে এসে জামাআতে শরীক হবে এ উদ্দেশ্য নিয়ে বাইরে যায়, তাহলে তা মাকরূহ নয়। হাদীস শরীফে এ সম্পর্কে এসেছে-

عَنْ عُثْمَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَدْرَكَهُ الْأَذَانُ فِي الْمَسْجِدِ، ثُمَّ خَرَجَ لَمْ يَخْرُجْ لِحَاجَةٍ، وَهُوَ لَا يُرِيدُ الرَّجْعَةَ، فَهُوَ مُنَافِقٌ

-হযরত উসমান (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি মসজিদে থাকাবস্থায় আযান হলো, অতঃপর সে কোন প্রয়োজন ব্যতীত মসজিদ থেকে বের হলো এবং সে ফিরে আসার সংকল্প করে না, অবশ্যই সে মুনাফিক। (সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-৭৩৪)

সুনান আত তিরমিযী, সুনান আবূ দাউদ, সুনান ইবন মাজাহ ও আরো বহু হাদীসগ্রন্থে বর্ণিত রিওয়ায়াতে এসেছে-

عن أبي الشَّعْثَاءِ، قال: خرجَ رجلٌ من المسجد بعدَما أُذِّنَ فيه بالعصر، فقال أبو هريرة: أمَّا هذا فقد عَصَى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم

-হযরত আবুশ শা'সা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, মসজিদে আসরের আযান হওয়ার পর একজন লোক মসজিদ থেকে (নামায না পড়ে) বের হলে হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) বললেন, এ ব্যক্তি আবুল কাসিম (রাসূলুল্লাহ) ﷺ এর অবাধ্যতা করল। (সুনান আত তিরমিযী, হাদীস-২০২)

উপরোক্ত হাদীস মাওকূফ হলেও এরূপ মাওকূফ হাদীস মারফু হাদীসের পর্যায়ের। এ বিষয়ে রদ্দুল মুহতার কিতাবে লিখেছেন-

(قَوْلُهُ وَكُرِهَ تَحْرِيمًا لِلنَّهْيِ) وَهُوَ مَا فِي ابْنِ مَاجَهْ «مَنْ أَدْرَكَ الْأَذَانَ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ خَرَجَ لَمْ يَخْرُجْ لِحَاجَةٍ وَهُوَ لَا يُرِيدُ الرُّجُوعَ فَهُوَ مُنَافِقٌ» وَأَخْرَجَ الْجَمَاعَةُ إلَّا الْبُخَارِيَّ عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ "كُنَّا مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الْمَسْجِدِ، فَخَرَجَ رَجُلٌ حِينَ أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ لِلْعَصْرِ. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ" وَالْمَوْقُوفُ فِي مِثْلِهِ كَالْمَرْفُوعِ بَحْرٌ (قَوْلُهُ مِنْ مَسْجِدٍ أُذِّنَ فِيهِ) أَطْلَقَهُ، فَشَمِلَ مَا إذَا أُذِّنَ وَهُوَ فِيهِ أَوْ دَخَلَ بَعْدَ الْأَذَانِ كَمَا فِي الْبَحْرِ وَالنَّهْرِ

(রদ্দুল মুহতার, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৫৪; مَطْلَبٌ فِي كَرَاهَةِ الْخُرُوجِ مِنْ الْمَسْجِدِ بَعْدَ الْأَذَانِ)

মো: কামরুল হাসান
উপশহর, সিলেট

প্রশ্ন: মানুষ মারা যাওয়ার পর শোক প্রকাশার্থে লিখা হয় "অকাল মৃত্যুতে আমরা শোকাহত"। অকাল শব্দটি লিখা জায়িয কি না। এই সম্পর্কে ইসলাম কী বলে? জানতে চাই।

জবাব: মৃত্যুর সময় যেহেতু পূর্ব নির্ধারিত। আর মৃত্যুর জন্য কোন বয়সের পরিমাণ পূর্ণ হওয়ার বিষয় অপরিহার্য নয়। যদিও কারো মৃত্যু অন্য কারো মৃত্যুর চেয়ে অধিক বেদনাদায়ক হতে পারে। তাই কারো শোক প্রকাশে "অমুকের অকাল মৃত্যুতে আমরা শোকাহত" বলা অনুচিত। এর পরিবর্তে অমুকের বিরহ কিংবা বিচ্ছেদে বা মৃত্যুতে আমরা শোকাহত বলা যেতে পারে। মহান আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন-

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا

-আল্লাহর হুকুম ছাড়া কেউ মরতে পারে না, যেহেতু এর সময় নির্ধারিত। (সূরা আলে ইমরান, আয়াত-১৪৫)

মহান আল্লাহ তাআলা অন্যত্র ইরশাদ করেছেন-

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جاءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ ساعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُون–

-প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট সময় রয়েছে। যখন তাদের সে নির্দিষ্ট সময় এসে যাবে, তখন তারা না এক মুহূর্ত পিছে যেতে পারবে, আর না এগিয়ে আসতে পারবে। (সূরা আ'রাফ, আয়াত-৩৪)

অনুরূপ আল্লাহ তাআলা আরো ইরশাদ করেছেন,

فَإِذا جاءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ ساعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ

-যখন তাদের সে নির্দিষ্ট সময় এসে যাবে, তখন তারা না এক মুহূর্ত পিছে যেতে পারবে, আর না এগিয়ে আসতে পারবে। (সূরা নাহল, আয়াত-৬১)

সহীহ মুসলিম, সুনান আবূ দাউদ ও অন্যান্য হাদীসগ্রন্থের বর্ণনায় এসেছে-

عن عبدُ الله بنُ مسعودٍ قال: حدَّثنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادِقُ المصدوقُ: "إنّ خَلقَ أحدِكُمْ يُجمَعُ في بَطنِ أُمّه أربعين يوماً، ثم يكونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذلك، ثم يكونُ مُضغةً مِثلَ ذلك، ثم يُبعَثُ إليه مَلَكٌ، فيُؤمَرُ باربعِ كلماتٍ: فيكتُبُ رِزقَه وأجَلَه وعَمَله، ثم يكتُبُ: شقي أو سعيدٌ، ثم يَنفُخُ فيه الروحَ، فإن أحدَكُم ليَعمَلُ بعَمَلِ أهلِ الجنةِ حتى ما يكونُ بينَه وبينها إلا ذِراعٌ، أو قِيدُ ذراعٍ، فيَسبِقُ عليه الكتابُ، فيعملُ بعملِ أهلِ النار، فيدخُلُها، وإن أحدكم ليَعمَلُ بعملِ أهل النار حتى ما يكونَ بينه وبينها إلا ذراعٌ، أو قِيدُ ذِرَاعٍ، فيسبقُ عليه الكتابُ، فيعملُ بعمَلِ أهلِ الجنة فيدخُلُها"

-হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসঊদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সাদিকুল মাসদূক (সত্যবাদী ও সত্যনিষ্ঠরূপে প্রত্যয়িত) রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের হাদীস শুনিয়েছেন যে, তোমাদের প্রত্যেকের সৃষ্টি (শুক্রাণু) তার মাতৃ উদরে চল্লিশ দিন জমাট থাকে। এরপর তা রক্তপিণ্ডে পরিণত হয় এবং অনুরূপ চল্লিশ দিন থাকে। এরপর তা মাংসপিণ্ডে পরিণত হয়ে অনুরূপ (চল্লিশ দিন) থাকে। এরপর (আল্লাহ তাআলার তরফ থেকে) একজন ফিরিশতা পাঠানো হয়। আর তাঁকে চারটি বিষয় লিপিবদ্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়। ফলে তিনি তার রিযক, তার মৃত্যুক্ষণ, তার আমলের বিষয় লিখে দেন। এরপর সে বদকার না নেককার তাও লিখে দেন। অতঃপর তার মধ্যে রূহ ফুঁকে দেওয়া হয়। নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ জান্নাতীদের মতো আমল করতে থাকে। অবশেষে তার ও জান্নাতের মাঝখানে মাত্র একহাত ব্যবধান থাকে। এরপর তাকদীরের লিখন তার উপর জয়ী হয়ে যায়। ফলে সে জাহান্নামীদের ন্যায় কাজ-কর্ম শুরু করে। এরপর সে জাহান্নামে প্রবেশ করে। আর তোমাদের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি জাহান্নামের কাজ-কর্ম করতে থাকে। অবশেষে তার ও জাহান্নামের মাঝখানে একহাত মাত্র ব্যবধান থাকে। এরপর ভাগ্যলিপি তার উপর জয়ী হয়। ফলে সে জান্নাতীদের ন্যায় আমল করে। অবশেষে জান্নাতে দাখিল হয়। (সহীহ বুখারী, হাদীস-৭৪৫৪; সহীহ মুসলিম, হাদীস-২৬৪৩; সুনান আবূ দাউদ, হাদীস-৪৭০৮)

জুনেদ আহমদ
বড়লেখা, মৌলভীবাজার

প্রশ্ন: আমরা ইশার ফরয নামাযের পূর্বে সুন্নাতে যায়িদা হিসেবে চার রাকাআত নামায পড়ি। এই চার রাকাআত নামাযের দলীল জানতে চাই।

জবাব: হাদীস শরীফের একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইশার পূর্বে চার রাকাআত নামায কখনো কখনো পড়তেন। উক্ত বর্ণনার ভিত্তিতে ফুকাহায়ে কিরামের কেউ কেউ ইশার পূর্বে চার রাকাআত নামায সুন্নাতে যায়িদা বা মানদূব হিসেবে পরিগণিত করেছেন। এ সম্পর্কে আল বাহরুর রাইক কিতাবে লিখেছেন-

نُقِلَ فِي الِاخْتِيَارِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الْعِشَاءِ أَرْبَعًا ثُمَّ يُصَلِّي بَعْدَهَا أَرْبَعًا ثُمَّ يَضْطَجِعُ» اهـ. وَنَقَلَهُ عَنْهُ أَيْضًا فِي إمْدَادِ الْفَتَّاحِ ثُمَّ قَالَ وَذَكَرَ فِي الْمُحِيطِ إنْ تَطَوَّعَ قَبْلَ الْعَصْرِ بِأَرْبَعٍ وَقَبْلَ الْعِشَاءِ بِأَرْبَعٍ فَحَسَنٌ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُوَاظِبْ عَلَيْهَا

-আল ইখতিয়ার কিতাবে লিখা হয়েছে যে, হযরত আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইশার আগে চার রাকাআত নামায পড়তেন এবং পরে আরো চার রাকাআত পড়ে শুয়ে যেতেন। ইমদাদুল ফাত্তাহ কিতাবে তার উদ্বৃতি দিয়ে একথা লিখার পর বলেছেন, মুহীত কিতাবে উল্লেখ হয়েছে যে আসর ও ইশার পূর্বে চার রাকাআত করে নফল পড়লে তা উত্তম। কেননা নবী ﷺ তা সার্বক্ষণিক পড়েননি। (বাহরুর রাইক, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৫৪)

হাশিয়াতুত তাহতাবী কিতাবে লিখেছেন-

و ندب أربع قبل "العشاء" لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنه عليه السلام كان يصلي قبل العشاء أربعا ثم يصلي بعدها أربعا ثم يضطجع

-ইশার পূর্বে চার রাকাআত নফল পড়লে তা উত্তম। যেহেতু হযরত আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইশার আগে চার রাকাআত নামায পড়তেন এবং পরে আরো চার রাকাআত পড়ে শুয়ে যেতেন। (হাশিয়াতুত তাহতাবী, পৃষ্ঠা-৩৯০)

নূরুল ইযাহ কিতাবে লিখেছেন-

وندب أربع قبل العصر والعشاء وبعده

-আসরের পূর্বে এবং ইশার পূর্বে ও পরে চার রাকাআত করে পড়লে তা উত্তম। (নূরুল ইযাহ, পৃষ্ঠা-৭৯)

মারাকিল ফালাহ কিতাবে লিখেছেন,

و"ندب أربع قبل "العشاء" لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنه عليه السلام كان يصلي قبل العشاء أربعا ثم يصلي بعدها أربعا ثم يضطجع

-ইশার পূর্বে চার রাকাআত নফল পড়লে তা উত্তম। যেহেতু হযরত আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইশার আগে চার রাকাআত নামায পড়তেন এবং পরে আরো চার রাকাআত পড়ে শুয়ে যেতেন। (মারাকিল ফালাহ, পৃষ্ঠা-১৪৬)

হাবিবুর রহমান
লন্ডন, যুক্তরাজ্য

প্রশ্ন: মাগরিবের ফরযের আগে ২ রাকআত সুন্নাত পড়া যায় কি না? আমি বিদেশে এক মসজিদে নামায পড়ি তারা আগে সুন্নাত পড়ে। তাই এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে চাই।

জবাব: মাগরিবের আযানের পর ফরযের আগে যে দু'রাকআত নামায কোথাও কেউ কেউ পড়তে দেখা যায়, সে নামায সম্পর্কে ফুকাহায়ে কিরামের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। কারো কারো মতে এটি মুস্তাহাব হলেও হানাফী ও মালিকী ফকীহগণ এর বিপক্ষে মত দিয়েছেন। কেননা সুনান আবূ দাউদে উল্লেখিত হযরত ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীস শরীফে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর যুগে সাহাবায়ে কিরামগণের কেউ এটি পড়তেন না। উপরন্তু হযরত ইবরাহীম নাখাঈ (র.) উক্ত নামায পড়তে নিষেধ করতেন এবং বলতেন, এ নামায রাসূলুল্লাহ ﷺ, হযরত আবূ বকর (রা.) ও হযরত উমর (রা.) পড়তেন না। অবশ্য সহীহ বুখারীর বর্ণনায় এ দু'রাকাআত পড়ার বিষয়ে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আর সে হাদীসের ভিত্তিতে কেউ কেউ উক্ত দু'রাকআত পড়ে থাকেন। তবে এর বিপরীতে বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত যেসকল বর্ণনা বিদ্যমান রয়েছে সেগুলো অগ্রগণ্য হওয়াই সমীচীন।

এ সম্পর্কে ফাতহুল কাদীর ও বাযলুল মাজহুদ কিতাবে লিখেছেন-

وَإِذْ قَدْ صَحَّ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ عِنْدَنَا عَارَضَ مَا صَحَّ فِي الْبُخَارِيِّ، ثُمَّ يَتَرَجَّحُ هُوَ بِأَنَّ عَمَلَ أَكَابِرِ الصَّحَابَةِ كَانَ عَلَى وَفْقِهِ كَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ حَتَّى نَهَى إبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ عَنْهُمَا فِيمَا رَوَاهُ أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْهُ أَنَّهُ نَهَى عَنْهُمَا وَقَالَ :إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لَمْ يَكُونُوا يُصَلُّونَهُمَا

(ফাতহুল কাদীর, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৪৫-৪৪৬; বাযলুল মাজহুদ, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৫০৪)

আল লুবাব ফী শারহিল কিতাব নামক গ্রন্থে লিখেছেন-

(و) يستحب (تعجيل المغرب) مطلقا؛ فلا يفصل بين الآذان والإقامة إلا بقدر ثلاث آيات أو جلسة خفيفة

মাগরিবের নামায সাধারণতঃ অবিলম্বে পড়া মুস্তাহাব। তাই আযান ও ইকামতের মধ্যে তিন আয়াত পাঠের সময় পরিমাণ কিংবা সংক্ষিপ্ত একটি বৈঠকের অধিক বিলম্ব করা যাবে না। (লুবাব ফী শারহিল কিতাব, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৫৮)

উক্ত মাসআলার বর্ণনায় আল বাহরুর রাইক কিতাবে লিখেছেন-

(قَوْلُهُ: وَقَبْلَ الْمَغْرِبِ) أَيْ وَمُنِعَ عَنْ التَّنَفُّلِ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ لِمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد «سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ فَقَالَ مَا رَأَيْت أَحَدًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيهِمَا» وَهُوَ يَقْتَضِي نَفْيَ الْمَنْدُوبِيَّةِ، أَمَّا تُبُوتُ الْكَرَاهَةِ فَلَا إلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ آخَرُ وَمَا ذُكِرَ مِنْ اسْتِلْزَامِ تَأْخِيرِ الْمَغْرِبِ فَقَدْ قَدَّمْنَا عَنْ الْقُنْيَةِ اسْتِثْنَاءَ الْقَلِيلِ وَالرَّكْعَتَانِ لَا تَزِيدُ عَلَى الْقَلِيلِ إذْ تَجُوزُ فِيهِمَا وَفِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ» وَهُوَ أَمْرُ نَدْبٍ وَهُوَ الَّذِي يَنْبَغِي اعْتِقَادُهُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ

সুর্যাস্তের পর মাগরিবের পূর্বে কোনো নফল পড়া যাবে না। যেহেতু আবূ দাউদের বর্ণনায় এসেছে যে, হযরত ইবন উমর (রা.) কে এ দু'রাকআত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর যুগে সাহাবায়ে কিরামের কাউকে এটি পড়তে দেখিনি। তাই এটি মুস্তাহাব বা নফল হিসেবে বিবেচিত নয়। তবে একে মাকরূহ বলা যাবে না, যেহেতু এর মাকরূহ হওয়ার বিষয়ে অন্য কোনো দলীল নেই। (বাহরুর রাইক, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৬৬)

ফাতহুল কাদীর কিতাবে উক্ত মাসআলার বিবরণে লিখেছেন-

هَلْ يُنْدَبُ قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَانِ؟ ذَهَبَتْ طَائِفَةٌ إلَيْهِ، وَأَنْكَرَهُ كَثِيرٌ مِنْ السَّلَفِ وَأَصْحَابِنَا وَمَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ– تَمَسَّكَ الْأَوَّلُونَ بِمَا فِي الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ، ثُمَّ قَالَ صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ لِمَنْ شَاءَ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً» وَفِي لَفْظٍ لِأَبِي دَاوُد «صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ» زَادَ فِيهِ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ «وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ» وَلِحَدِيثِ أَنَسٍ فِي الصَّحِيحَيْنِ «كَانَ الْمُؤَذِّنُ إذَا أَذَّنَ لِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ قَامَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْتَدِرُونَ السَّوَارِيَ فَيَرْكَعُونَ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى إنَّ الرَّجُلَ الْغَرِيبَ لَيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ فَيَحْسَبُ أَنَّ الصَّلَاةَ قَدْ صُلِّيَتْ مِنْ كَثْرَةِ مَنْ يُصَلِّيهِمَا» الْجَوَابُ الْمُعَارَضَةُ بِمَا فِي أَبِي دَاوُد عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: «سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ فَقَالَ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيهِمَا. وَرَخَّصَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ»، سَكَتَ عَنْهُ أَبُو دَاوُد وَالْمُنْذِرِيُّ بَعْدَهُ فِي مُخْتَصَرِهِ وَهَذَا تَصْحِيحٌ، (ফাতহুল কাদীর, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪৪৫)

ঘরোয়া

ফাহমিদা খান তন্মনা

গৃহস্থালির জন্য উপকারী কিছু ঘরোয়া টিপস।

➢ একটি লেবু টুকরো টুকরো করে কেটে ফ্রিজে রেখে দিন, ফ্রিজের ভেতরে কোনো দুর্গন্ধ হবে না।

➢ সবজি কাটার আগে হাতে সরিষার তেল মাখলে হাতে কালচে দাগ পড়বে না।

➢ লবণ দিয়ে ঘষলে চায়ের কাপে লেগে থাকা বাদামি রংয়ের দাগ উঠে যায়।

➢ রান্নাঘরে কর্পূর ছিটিয়ে রাখলে ছারপোকার উপদ্রব কমে যাবে।

➢ কয়েক ফোটা ভিনিগার ছিটিয়ে বাসনপত্র ধুয়ে নিলে আঁশটে গন্ধ থাকে না।

➢ চিনির পাত্রে কয়েকটি লবঙ্গ দিয়ে রাখলে পিঁপড়া আসবে না।

➢ তেলে আচার ডুবিয়ে রাখলে আচারে ফাঙ্গাস পড়ে না অথবা আচার তৈরি করার সময় তেলে একটু ভিনিগার মিশিয়ে নিলে আচার অনেকদিন ভালো থাকে।

➢ কয়েকটা শুকনো চাল দেশলাই বক্সে রেখে দিলে বর্ষাকলেও দেশলাই কাঠির বারুদ ভাল থাকে।

➢ একসাথে অনেক রসুন ছাড়াতে সময় বেশি লাগে। আস্ত রসুন ফুটন্ত জলে মিনিট দুয়েক ভিজিয়ে হাতে ঘষলে ওপরের খোসা ছেড়ে যায়।

➢ পিঁয়াজ কাটার আগে দু'ফালি করে কিছুক্ষণ পানিতে ভিজিয়ে রেখে তারপর পিঁয়াজ কাটলে চোখে পানি আসে না।

➢ যদি সাধারণ টিফিন বাক্সে ঘরের খাবার বাইরে নিতে হয় তাহলে বাতাসে খাবার ঠান্ডা করে নিন। কখনোই গরম গরম খাবার সাধারণ টিফিন বাক্সে নেওয়া যাবে না, এতে খাবার গন্ধ হয়ে যেতে পারে।

➢ বাজার থেকে কেনা যে কোনো পাকা ফল খাওয়ার আগে অন্ততঃ আধঘন্টা পানিতে ভিজিয়ে রাখা উচিত। কারণ বেশির ভাগ ব্যবসায়ীরা ফল পাকানো ও সংরক্ষণের জন্য কারবাইড ও ফরমালিন ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

➢ ভাত সিদ্ধ হওয়ার আগে এক চামচ তেল ও কয়েক ফোটা লেবুর রস দিলে ভাত ঝরঝরা থাকে।

➢ নুডলস্ সিদ্ধ করার পর সাথে সাথে ঠান্ডা পানি দিয়ে ধুয়ে নিলে ঝরঝরা থাকে।

➢ রুটি তৈরির আগে অল্প সময়ের জন্য বেলনা ফ্রিজে ঠান্ডা করুন। তাহলে রুটি বেলার সময় বেলনায় ময়দা বা আটা জড়িয়ে যাবে না।

➢ পরোটা নরম রাখার জন্য জন্য ময়দা গরম পানি বা টকদই দিয়ে মেখে পাতলা কাপড় দিয়ে কিছুক্ষণ জড়িয়ে রাখুন। দেখবেন খুব সুন্দর নরম ও মজাদার হয়েছে।

➢ হাত পুড়ে গেলে টুথপেস্ট অথবা পাকা কলা মেখে দ্রুত পোড়া স্থানে লাগিয়ে দিন। জ্বালা পোড়া কমে যাবে।

➢ কাগজ পোড়া ধোঁয়া দিলে রান্নাঘরে মাকড়সার উৎপাত কমে যাবে।

ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষার সমন্বয়ে একটি মডেল প্রতিষ্ঠান

সিরাজাম মুনিরা লতিফিয়া মাদরাসা

SIRAJAM MUNIRA LATIFIA MADRASAH

স্থাপিত: ২০২৪ইং

প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্যসমূহ:

* আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন হিফযুল কুরআন।
* হিফজের পাশাপাশি ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত সাধারণ শিক্ষার ব্যবস্থা।
* নাহু সরফ বিষয়ে বিশেষ কোর্সের ব্যবস্থা।
* ইসলামী ও আধুনিক শিক্ষা সমন্বিত সিলেবাস।
* দুর্বল ছাত্র/ছাত্রীদের প্রতি বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা।
* অনলাইনের মাধ্যমে ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক স্কলার দ্বারা বিশেষ পাঠদান।
* সুন্নাতে নববীর অনুসরণ ও উত্তম চরিত্রের উপর গুরুত্বারোপ।
* সুন্দর মননের জন্য সাপ্তাহিক সভা, বিভিন্ন জাতীয় ও ধর্মীয় দিবস উদযাপন।
* গরীব, ইয়াতীম শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ সুযোগ-সুবিধা।
* সার্বক্ষণিক সিসি ক্যামেরা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

আবাসিক অনাবাসিক

ভর্তি চলছে

যোগাযোগ

মাওলানা মো: ইয়াকুব আলী

প্রিন্সিপাল

মোবাইল: 01715-526279

সোনাপুর, কালেঙ্গা রোড, মৌলভীবাজার সদর। মোবাইল: ০১৩১৮-৫২৮২৫৭

বিজ্ঞান

পরওয়ানা ডেস্ক

মানুষ বনাম এআই

চ্যাটজিপিটি (ChatGPT)-এর নাম শুনেননি এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া দুস্কর। এটা এখন ব্যাপক আলোচনার বিষয়। বিশেষ করে যারা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার করেন, তারা এই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যাপারে জানেন। চ্যাটজিপিটি মূলত একটি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ভিত্তিক সার্চ টুল, যাকে কিছু জিজ্ঞেস করলে মানুষের মতো সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিতে সক্ষম। যেমন: যদি জানতে চাওয়া হয় সৌরজগতের সবচেয়ে বড় গ্রহ কোনটি? এ জন্য চ্যাটজিপিটিতে গিয়ে লিখতে হবে, Which one is the largest planet of our solar system? বা সংক্ষেপে Largest planet in solar system? মুহূর্তের মধ্যে চ্যাটজিপিটি সঠিক উত্তর বলে দেবে। ব্যবহারকারীর যে কোনও প্রশ্নের উত্তর গঠনমূলক এবং সহজ ভাবে প্রদর্শন করে এই চ্যাটজিপিটি। এমনকী এটি আপনার জন্য কবিতা লিখে দিতে পারে, আপনার পরীক্ষার প্রশ্নের উত্তর লিখে দিতে পারে, অর্থনীতি-রসায়ন থেকে শুরু করে বিভিন্ন বিষয়ের একাধিক প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে। ইন্টারনেটে থাকা ওয়েবপেজ, ওয়েব টেক্সট, বই, উইকিপিডিয়া, আর্টিকেলসহ বিভিন্ন সোর্সের প্রায় ৫৭০ জিবির বেশি ডাটা সমৃদ্ধ চ্যাটজিপিটিতে রয়েছে ৩০০ বিলিয়ন শব্দের ভান্ডার। আবার বিং-এর ইমেজ ক্রিয়েটর কিংবা মিডজার্নি সফটওয়্যার-কে ছবি বানিয়ে দিতে বললে একটা ছবি বানিয়ে দেবে। কীভাবে বলবেন? ওপরে যেভাবে লিখে চ্যাটজিপিটি-কে জিজ্ঞেস করা হয় একইভাবে লিখে বলতে হবে, আপনি কী ধরনের ছবি বানাতে চান। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আপনাকে কিছু সময়ের মধ্যে ছবি বানিয়ে দেবে। অর্থাৎ টেক্সট ইনপুট দিলে Artificial Intelligence বা AI আউটপুট দিবে ইমেজ বা ছবি। একইভাবে টেক্সট ইনপুট দিয়ে ভিডিওর কমান্ড দিলে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ভিডিও বানিয়ে দিতেও সক্ষম। আর এ কাজটি করবে সোরা (Sora) নামে একটি এআই। ভিডিওর পাশাপাশি অ্যানিমেশনও বানাতে পারবে এটি। তবে ভিডিও বানাতে পারবে ১ মিনিট দৈর্ঘ্যের।

অক্সিজেন ছাড়া বেঁচে থাকা প্রাণী

সাধারণত অক্সিজেন ছাড়া কোনো প্রাণী বাঁচতে পারে না। প্রাণীর সবচেয়ে প্রয়োজনীয় জিনিস হলো অক্সিজেন। কিন্তু অবাক করা তথ্য হলো, ইদানীং পৃথিবীতে এমন প্রাণীর সন্ধান পাওয়া গেছে, যা অক্সিজেন ছাড়াই বাঁচতে পারে! তবে, বিস্ময়কর এ প্রাণীটিকে খালি চোখে দেখা যায় না, অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখতে হয়। কারণ, এটি পরজীবি। বিজ্ঞানীরা এটির নাম দিয়েছেন হেনেনেগুয়া স্যালমিনিকোলা। তেল-আবিব বিশ্ববিদ্যালয় ও যুক্তরাষ্ট্রের অরেগন বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল গবেষক ২০২০ সালে প্রাণীটি আবিষ্কার করেছেন। পরজীবীটি স্যামন মাছের কোষের ভেতর থাকে। এক কোষী এই প্রাণীটির অক্সিজেন গ্রহণের কোনো প্রত্যঙ্গই নেই। স্যামন মাছের যে স্থানে এই পরজীবী বাস করে, সেখানেও কোনো অক্সিজেন থাকে না। মাছের প্রক্রিয়াজাত পুষ্টি খেয়েই পরজীবীটি বেঁচে থাকে। অক্সিজেনের পরিবর্তে প্রাণীগুলো কীসের ওপর নির্ভর করে বেঁচে থাকে, বিজ্ঞানীরা এখনো তা জানেন না। এ ব্যাপারে গবেষণা চলমান।

প্রতিদিন ১৬ বার সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত

এমন অনেক মানুষ আছেন যারা সূর্যোদয় আর সূর্যাস্ত দেখার সুযোগই পান না। পৃথিবীতে প্রতিদিন সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত দেখতে পেলেও মহাকাশে ভাসমান আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশন International Space Station (ISS) থেকে প্রতিদিন ১৬ বার সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত দেখা যায়! আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশন হলো পৃথিবীর নিম্ন কক্ষপথে অবস্থিত একটি বাসযোগ্য কৃত্রিম উপগ্রহ। এটি পাঁচটি মহাকাশ গবেষণা সংস্থার একটি সমন্বিত প্রকল্প। ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৪০০ কিলোমিটার উপরে প্রতি ঘণ্টায় প্রায় ২৮ হাজার কিলোমিটার গতিতে প্রতি ৯০ মিনিটে মহাকাশ স্টেশনটি পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ করে। গ্রহের চারপাশে এমন দ্রুত অভিযাত্রার কারণে আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনের নভোচারীরা প্রতি ৪৫ মিনিটে একবার সূর্যোদয় বা সূর্যাস্তের সাক্ষী হচ্ছেন। প্রতিদিন এতবার সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত দেখার কারণে নভোচারীরা প্রথাগত ঘড়ি দেখে দিন-রাতের হিসাব করেন না; কিছুটা ভিন্নভাবে গণনা করেন। তারা সেখানে কোর্ডিনেটেড ইউনিভার্সাল টাইম (ইউটিসি) ব্যবহার করেন।

বাংলা জাতীয় মাসিক
পরওয়ানা
জীবন জিজ্ঞাসা বিভাগে

“ঈমান, আমাল ও আকীদা বিষয়ক আপনার যেকোনো প্রশ্ন আজই পরওয়ানার অনুকূলে পাঠিয়ে দিন।???

প্রশ্ন করার নিয়ম
- শুধুমাত্র প্রশ্নের মূল কথাগুলো লিখে পাঠাতে হবে
- ই-মেইল অথবা ডাকযোগে প্রশ্ন পাঠাতে পারবেন

প্রশ্ন করুন

প্রশ্ন পাঠানোর ঠিকানা

অফিস: ফুলতলী কমপ্লেক্স ঢাকা, ৩৩৪/৪এ, দক্ষিণ গোড়ান, খিলগাঁও, ঢাকা-১২১৯
সিলেট বিভাগীয় অফিস: পরওয়ানা ভবন-৭৪, শাহজালাল লতিফিয়া আ/এ, সোবহানীঘাট, সিলেট
E-mail: parwanabd@gmail.com

অভ্যন্তরীণ

ইসকন নেতা গ্রেফতার

গত ২৫ নভেম্বর, সোমবার বিতর্কিত হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী সংগঠন ইসকনের বহিষ্কৃত নেতা চিন্ময় কৃষ্ণ দাশ ব্রহ্মচারীকে রাষ্ট্রদ্রোহীতার মামলায় শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে গ্রেফতার করেছে গোয়েন্দা পুলিশ।

পরদিন ২৬ নভেম্বর, মঙ্গলবার দুপুরে তাকে চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন-৬ এর আদালতে তোলা হলে জামিন আবেদন না মঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন বিচারক। এরপর উচ্ছৃঙ্খল ইসকন সমর্থকেরা চট্টগ্রাম আদালত প্রাঙ্গনে প্রিজন ভ্যান ঘিরে বিক্ষোভ করে। প্রায় সোয়া ১২টা থেকে পৌনে ৩টা পর্যন্ত বিক্ষোভের পর পুলিশ সাউন্ড গ্রেনেড ছুঁড়ে বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করে চিন্ময় দাশকে কারাগারে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়। এ সময় বিক্ষোভকারীরা আদালত সড়কে রাখা যানবাহন ভাংচুর করে। বিক্ষোভকারীদের ঢিলে আদালত মসজিদ কমপ্লেক্সের দ্বিতীয় তলার কাঁচ ভেঙে যায়। একসময় আদালতের কর্মচারী ও সাধারণ আইনজীবীরা মিলে তাদের ধাওয়া করে। উভয় পক্ষের ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ার মধ্যে রঙ্গম কনভেনশন হল সড়কে আইনজীবী সাইফুল ইসলাম আলিফকে হত্যা করা হয়। এই ঘটনার পর নগরীর বিভিন্ন স্থানে সতর্ক অবস্থান নেন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা।

তালামীযে ইসলামিয়ার বিক্ষোভ মিছিল

চট্টগ্রাম আদালত প্রাঙ্গণে আইনজীবী খুনের প্রতিবাদে ও বাংলাদেশে ইসকনের কার্যক্রম নিষিদ্ধের দাবিতে তালামীযে ইসলামিয়া সিলেট মহানগর ও জেলার উদ্যোগে আধ্যাত্মিক রাজধানী পুণ্যভূমি সিলেট নগরীতে শুক্রবার (২৯ নভেম্বর, ২০২৪) বাদ জুমআ বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বিক্ষোভ মিছিল পরবর্তী সমাবেশে তালামীযে ইসলামিয়ার কেন্দ্রীয় সভাপতি মাহবুবুর রহমান ফরহাদ বলেন, ন্যায়ের পক্ষে কথা বলায় আদালত প্রাঙ্গণে দিনেদুপুরে আইনজীবীকে হত্যা করা হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, এখনো আসামীদের নাম জনসম্মুখে প্রকাশ করা হয় নাই। আমরা প্রকৃত দোষীদের সর্বোচ্চ শাস্তি ফাঁসি চাই। আইনজীবীদের নামাযের জন্য বানানো মসজিদও নাকি গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। আমরা কোনো ধর্মের বিরুদ্ধে নই, কিন্তু যেখানেই উগ্রবাদ বা সন্ত্রাসবাদ, সেখানেই আমাদের প্রতিবাদ। ছাত্রদের আন্দোলনের ফসল হিসেবে যে সরকার মসনদে আছেন, তাদেরকে দেশের মানুষের পালস বুঝতে হবে। সন্ত্রাসী ইসকনের কার্যক্রম এদেশে নিষিদ্ধ করতে হবে এবং আইনজীবীর হত্যাকারীকে সর্বোচ্চ শাস্তি দিতে হবে।

সংগঠনের সিলেট মহানগরীর সভাপতি হুসাইন আহমদ এর সভাপতিত্বে এবং সিলেট পশ্চিম জেলা সভাপতি শেখ রেদওয়ান হোসেন ও সিলেট পূর্ব জেলা সভাপতি মুহাম্মদ জিল্লুর রহমান এর যৌথ সঞ্চালনায় বিক্ষোভ মিছিল পরবর্তী সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ সুপ্রিমকোর্টের আইনজীবী এডভোকেট মাওলানা আব্দুর রকিব, তালামীযে ইসলামিয়ার সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি সভাপতি মাওলানা মুফতি বেলাল আহমদ, আনজুমানে আল ইসলাহ'র প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আবু ছালেহ মোহাম্মদ কুতবুল আলম, তালামীযে ইসলামিয়ার সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি মাওলানা রেদওয়ান আহমদ চৌধুরী ফুলতলী প্রমুখ।

সিলেটে অপহরণের পর শিশু হত্যা

গত ৩ নভেম্বর, রবিবার সকালে সিলেটের কানাইঘাট উপজেলা সদর ইউনিয়নের বীরদলের ভাড়ারিফৌদ গ্রামের মুনতাহা আক্তার নামের একটি মেয়ে নিখোঁজ হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মেয়েটি বাবার সঙ্গে একটি ওয়াজ মাহফিলে গিয়েছিল। সেখান থেকে ফিরে এসে প্রতিবেশী শিশুদের সঙ্গে খেলতে যায়। এরপর আর তার সন্ধান পাওয়া যায়নি। নিখোঁজের পর বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ঘুরে বেড়াচ্ছিল নিখোঁজ শিশু মুনতাহার ফুটফুটে একটি ছবি। শিশুটির হাসিমাখা মুখের ছবি যার দৃষ্টিতে পড়েছে তাকেই থমকে দীর্ঘ নিঃশ্বাস নিতে হয়েছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে শিশুটির ছবি দেখতে দেখতে তার জন্য মানুষের মনে বিপুল আকুতি জমে ওঠে। মুনতাহাকে জীবিত খুঁজে পেতে মানুষ প্রার্থনা করে। নিখোঁজের ছয় দিন পর রাত ৪টার দিকে শিশু মুনতাহা আক্তারের লাশ খুঁজে পাওয়া যায় তাদের বাড়ির পাশের ডোবায়। তাৎক্ষণিকভাবে ওই এলাকায় বিপুল মানুষের সমাগম ঘটে। ধারণা করা হচ্ছে নিখোঁজের দিনই কোনো একসময় মুনতাহাকে হত্যা করে লাশ গুম করতে বাড়ির পাশের ডোবায় পুঁতে রাখা হয়েছে। এরই মধ্যে শিশুটিকে হত্যার ঘটনায় অভিযুক্ত প্রতিবেশী মর্জিনা বেগমসহ চারজনকে আটক করেছে পুলিশ। আরও কয়েকজনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় নেওয়া হয়েছে।

প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ স্থগিত

১৯ নভেম্বর, মঙ্গলবার কোটা পদ্ধতি অনুসরণ করে নিয়োগ দেওয়ায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক পদে ৬ হাজার ৫৩১ জনের নিয়োগপত্র প্রদানের সিদ্ধান্ত স্থগিত করেছে হাইকোর্ট। বিচারপতি ফাতেমা নজীব ও বিচাপতি মাহমুদুর রাজীর হাইকোর্ট বেঞ্চ এ আদেশ দেন। গত ২৮ মে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক পদে ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগের জেলাগুলোর (তিন পার্বত্য জেলা ছাড়া) মৌখিক পরীক্ষাসহ নিয়োগপ্রক্রিয়া ছয় মাসের জন্য স্থগিত করেছিল হাইকোর্ট। এরপর মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণসংক্রান্ত হাইকোর্ট যে স্থগিতাদেশ দিয়েছিল তা আপিল বিভাগ খারিজ করে দেয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে মৌখিক পরীক্ষা নেয় প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর। তবে এর আগে এই নিয়োগের জন্য লিখিত পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁস নিয়ে গণমাধ্যমে আসা অভিযোগ অনুসন্ধান করতে নির্দেশও দিয়েছিল আদালত।

ডেঙ্গু আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা বাড়ছে

নভেম্বর মাসের ২৭ তারিখ পর্যন্ত এডিস মশাবাহিত ডেঙ্গু রোগের কারণে ১৬০ জনের মৃত্যু হয়েছে। এটি চলতি বছর এখন পর্যন্ত এক মাসে সর্বোচ্চ মৃত্যু। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। তাছাড়া স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যমতে প্রতিদিন ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে প্রায় ৮৮৮ জন হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছেন। ঢাকা বিভাগের (দুই সিটি কর্পোরেশন বাদে) বিভিন্ন হাসপাতালে ডেঙ্গু নিয়ে প্রতিদিন সর্বোচ্চ ২৩৯ জন ভর্তি হয়েছেন। এ ছাড়া ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন এলাকায় ১৮৮, খুলনা বিভাগে ১১৭, ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন এলাকায় ১০৫, চট্টগ্রাম বিভাগে ৮০, বরিশাল বিভাগে ৫০, রাজশাহী বিভাগে ৩৯, ময়মনসিংহ বিভাগে ৩৭, রংপুর বিভাগে ১৭ ও সিলেট বিভাগের হাসপাতালে ডেঙ্গু নিয়ে ১৬ জন ভর্তি হয়েছেন। এখন পর্যন্ত চলতি বছরে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে ৮৯ হাজার ৬০৩ রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। গত অক্টোবর মাসে ডেঙ্গু নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ৩০ হাজার ৮৭৯ জন। চলতি মাসে এখন পর্যন্ত ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ২৭ হাজার ৭৮৬ জন।

প্রধান উপদেষ্টার সাথে বিএনপির সাক্ষাৎ

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনুস এর সঙ্গে দেখা করে বাংলাদেশে চলমান অস্থিরতা ও সাম্প্রতিক সহিংসতার ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) এর পাঁচ সদস্যের প্রতিনিধি দল। এসব অবস্থার অবসান ঘটিয়ে দেশের অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলার জন্য প্রধান উপদেষ্টার প্রতি তারা আহ্বান জানান। এছাড়াও, প্রয়োজনীয় সংস্কার শেষ করে দ্রুত নির্বাচনের রোডম্যাপ ঘোষণা করারও দাবি জানিয়েছে বিএনপি।

আন্তর্জাতিক

এ বছর নভেম্বর মাস মূলত মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের মাস হিসেবেই সবচেয়ে বেশি আলোচিত হয়েছে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে, এবং নির্বাচনের ফলাফল অনুযায়ী আদালত থেকে দণ্ডপ্রাপ্ত প্রথম ব্যক্তি হিসেবে মার্কিন রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। নভেম্বরের পাঁচ তারিখ নির্বাচন সম্পন্ন হলেও ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্বগ্রহণ করবেন আগামী জানুয়ারির ২০ তারিখ।

কাকতালীয় কিনা বলা কঠিন, একই দিনে যুক্তরাষ্ট্রে অবৈধ পোষ্যখ্যাত ইসরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী পদে পরিবর্তন আসে। নেতানিয়াহু তার মন্ত্রীসভার প্রতিরক্ষামন্ত্রীর পদ থেকে ইয়োভ গ্যালান্টকে বরখাস্ত করে ইসরায়েল কার্টজকে এই পদে নিযুক্ত করেন । ফিলিস্তিনীদের উপর বর্বরতা চালানোর বিষয়ে নেতানিয়াহু কিংবা ইয়োভ গ্যালেন্টের মধ্যে কোন ভিন্নমত না থাকলেও মূলত আভ্যন্তরীণ নানা ভিন্নমতের কারণে এমনটা হয়েছে বলে অনুমেয়। এর আগে চরমপন্থী সন্ত্রাসবাদী জাতীয় নিরাপত্তা মন্ত্রী বেনগাভির গ্যালেন্টকে সরানোর দাবি জানিয়েছিলেন, মূলত তাদের দ্বন্দ্ব কট্টর ধর্মবাদীতাকে কেন্দ্র করে, অন্যথায় ফ্যাসিবাদ ও সন্ত্রাসবাদের প্রশ্নে তারা প্রায় একই অবস্থানে রয়েছেন। গ্যালেন্ট হারেদিম নামে পরিচিত ইয়াহুদী ধর্মীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য সশস্ত্র বাহিনীতে অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক করতে চেয়েছিলেন, যাতে সে সকল ধর্মীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও ধর্মগুরুরা তার বিরুদ্ধে বেশ খেপেছিলেন। নেতানিয়াহু তাকে সরিয়ে মূলত বেনগভির ও সেসকল হারেদিমদেরকে সন্তুষ্ট করতে চেয়েছেন বলেই বিশ্লেষকদের ধারণা, যদিও এর ফলে গ্যালেন্টের অনুসারী ইসরায়েলে ব্যাপক বিক্ষোভ করেন।

৭ অক্টোবরের পর থেকে হামাস ও ইসরায়েলের মধ্যস্থতার জন্য অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে আসা কাতার অবশেষে ইসরায়েলের অসহযোগিতাপূর্ণ আচরণের কারণে মধ্যস্থতা থেকে নিজেদের সরিয়ে নিয়েছে। কাতারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তাদের মধ্যস্থতা কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে স্থগিত ঘোষণা করে। তবে উভয় পক্ষের সদিচ্ছা সাপেক্ষে এ প্রচেষ্টা পুনরায় চালু করার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয়নি কাতার। এদিকে এর পর কাতারের রাজধানীতে অবস্থিত হামাসের কার্যালয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে নানা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, যদিও হামাস কিংবা কাতার সরকার কোন পক্ষই এখনো এ বিষয়ে নিশ্চিত কোন তথ্য জানায় নি। কাতার মধ্যস্থতা থেকে সরে দাঁড়ানোর পর সৌদি আরব এ বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করতে কিছুটা আগ্রহী হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। সৌদি আরব এ উদ্দেশ্যে রিয়াদে আরব রাষ্ট্রসমূহের এক শীর্ষ সম্মেলনের আয়োজনও করেছে, যাতে কাতারের আমীরও অবশ্য অংশগ্রহণ করেছিলেন।

এদিকে গত নভেম্বরে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (আইসিসি) বহুল প্রতীক্ষিত গ্রেফতারি পরওয়ানা জারি করেছে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু, সদ্য সাবেক প্রতিরক্ষামন্ত্রী গ্যালেন্ট এবং হামাসের কমান্ডার ইন চিফ মুহাম্মাদ আল দেইফের বিরুদ্ধে। এর আগে আইসিসির চিফ প্রসিকিউটর করিম খান হামাসের তিন শীর্ষনেতা ও দুই ইসরায়েলী নেতার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরওয়ানার আবেদন জানালেও এরই মধ্যে হামাসের দুই শীর্ষনেতা ইসমাঈল হানিয়্যা ও ইয়াহইয়া সিনওয়ার শাহাদতবরণ করায় তাদের বিরুদ্ধে কোন গ্রেফতারি পরওয়ানা জারি হয়নি। মুহাম্মাদ আল দেইফকেও হত্যা করার কথা ইসরায়েল দাবি করলেও এখন অবধি হামাস তা স্বীকার করেনি। অবশ্য দেইফ জীবিত থাকুন কিংবা না থাকুন, তার যেহেতু আইসিসির সদস্য কোন রাষ্ট্র সফরের দূরতম সম্ভাবনাও নেই, ফলে তার জন্যে এ সিদ্ধান্তের কার্যকারিতা শূন্য। ইসরায়েলী দুই নেতার জন্য এর ফলে ইউরোপের অনেক দেশে প্রবেশ ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে, আইসিসির সদস্যভূক্ত এসকল রাষ্ট্র আইনত তাকে গ্রেফতার করতে বাধ্য। তবে হাঙ্গেরির প্রধানমন্ত্রী ভিক্টর অরবান জানিয়েছেন যে তিনি কেবল আদালতকে অমান্য করবেন না, তিনি নেতানিয়াহুকে বুদাপেস্ট ভ্রমণের আমন্ত্রণ জানাবেন। অরবান এই পরোয়ানাকে 'ভয়ঙ্করভাবে ঔদ্ধত্যপূর্ণ' এবং 'খামখেয়ালি' বলে অভিহিত করেছেন।

হাঙ্গেরির প্রতিরোধ সত্ত্বেও ইতালি, আয়ারল্যান্ড, বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ডস এবং ফ্রান্স জানিয়েছে যে তারা আদালতের সিদ্ধান্তকে সম্মান জানাবে এবং নেতানিয়াহু যদি তাদের কোনও দেশে ভ্রমণ করেন তবে তাকে গ্রেপ্তার করা হতে পারে এমন ইঙ্গিতও দিয়েছে এসকল দেশ। ইতালির প্রতিরক্ষামন্ত্রী গুইডো ক্রোসেত্তো বৃহস্পতিবার বলেছেন, নেতানিয়াহু ও গ্যালান্টকে হামাসের সঙ্গে তুলনা করা 'ভুল' হলেও তারা যদি ইতালিতে প্রবেশ করে তাহলে 'আমাদের তাদের গ্রেপ্তার করতে হবে'। আইসিসি যদিও তার সদস্য রাষ্ট্রসমূহকে কোন সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে বাধ্য করতে পারে না, তবে অনেক রাষ্ট্র অনিচ্ছা সত্ত্বেও এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের ইঙ্গিত দিচ্ছে, যা এ সকল রাষ্ট্রে ইসরায়েলী শীর্ষ নেতাদের ভ্রমণ ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলবে। সবচেয়ে বড় কথা, এর ফলে প্রথম বারের মতো ইসরায়েলের বিরুদ্ধে কোন আন্তর্জাতিক আইন প্রয়োগের সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে, যা ইসরায়েল ও তাদের মিত্রদের বিরুদ্ধে নিঃসন্দেহে অনেক বড় নৈতিক জয়, অন্তত ফিলিস্তিনী নেতৃবৃন্দ বিষয়টিকে এভাবেই দেখছেন। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আইসিসির সদস্য নয়, তাই তাদের এই সিদ্ধান্ত মানার কোন বাধ্যবাধকতা নেই। যুক্তরাষ্ট্র আইসিসির বিরুদ্ধে নানা হুমকি-ধামকিও দিচ্ছে এই বিষয়ে। কিন্তু মজার বিষয় হলো, যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্ক সিটির উগান্ডান বংশোদ্ভুত মেয়র যোহরান মামদানী ঘোষণা দিয়েছেন, তার শহরে নেতানিয়াহু কিংবা গ্যালেন্ট পা রাখলে সিটি পুলিশ তাদেরকে গ্রেফতার করবে। ভারতীয় বংশোদ্ভুত ব্রিটিশ-আমেরিকান সাংবাদিক মেহেদি হাসানকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি এ সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন। স্থানীয় পুলিশ এরকম সিদ্ধান্ত নিতে পারে কিনা, কিংবা গ্রেফতার পরবর্তী কার্যক্রম কী হবে, তা নিয়ে নানা আইনি জটিলতা থাকলেও মেয়রের এই ঘোষণার ফলে খোদ যুক্তরাজ্যের নিউ ইয়র্ক সিটিও নেতানিয়াহুর জন্য খানিকটা ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে গেলো, এমনটা বললে মোটেও অত্যুক্তি হবে না।

এদিকে ইসরায়েল খানিকটা ক্লান্ত হয়ে পড়ার ফলেই সম্ভবত, অবশেষে ইসরায়েলের সাথে হিযবুল্লাহর যুদ্ধবিরতি চুক্তি হয়েছে, এমনটাই জানা যাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্র এবং ফ্রান্সের মধ্যস্থতায় এ চুক্তির আলোকে ষাট দিনের মধ্যে ইসরায়েল তাদের সৈন্য লেবানন থেকে প্রত্যাহার করবে, আর হিযবুল্লাহ একই সময়সীমার মধ্যে তাদের সৈন্য সীমান্তবর্তী অঞ্চল থেকে প্রত্যাহার করবে, সীমান্তবর্তী অঞ্চলে কেবল লেবাননের সেনাবাহিনী এবং জাতিসংঘের বাহিনী মোতায়েন থাকবে, চুক্তি এমনটাই হয়েছে। এটিকে স্থায়ী যুদ্ধবিরতি চুক্তি বলা হলেও শেষ পর্যন্ত ইসরায়েল এ চুক্তি কতখানি মেনে চলবে তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রয়েছে বলে আন্তর্জাতিক বিশ্লেষকদের ধারণা। চুক্তি ঠিক মতো বাস্তবায়িত হচ্ছে কিনা, তা দেখার দায়িত্ব যুক্তরাষ্ট্র এবং ফ্রান্স গ্রহণ করেছে বলে জানা যায়।

এদিকে প্রতিবেশী দেশ ভারতের আসাম রাজ্যের করিমগঞ্জ জেলার নাম বদল নিয়ে দেখা সামাজিক মাধ্যমে নানা আলোচনা-সমালোচনার সৃষ্টি হয়েছে। গণভোটের ফলে পাকিস্তান তথা বর্তমান বাংলাদেশের অংশ হওয়ার কথা থাকলেও রেডক্লিফের কলমের খোঁচায় মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এই অঞ্চলটি চলে যায় ভারতে। বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী জকিগঞ্জ শহরের অবিচ্ছেদ্য অংশ করিমগঞ্জ হয়ে যায় ভিন্ন একটি দেশের জেলা শহর। এবার আসামের বিজেপি সরকার ঐতিহ্যবাহী এই শহরটির নাম বদলে রেখেছে 'শ্রীভূমি'। রবীন্দ্রনাথের কবিতা থেকে নামটি নেওয়া হয়েছে বলে আসাম সরকার দাবি করলেও বাস্তবে রবীন্দ্রনাথের কবিতায় করিমগঞ্জ নয়, বরং সিলেটকে শ্রীভূমি হিসেবে বিশেষায়িত করা হয়েছিল, করিমগঞ্জ সেই সিলেট জেলার অবিচ্ছেদ্য অংশ মাত্র।

নাম বদল নিয়ে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কে কোন প্রভাব না পড়লেও এই মাসেই ইসকন নেতা চিন্ময় কৃষ্ণ দাসের গ্রেফতারকে কেন্দ্র করে কূটনৈতিক পাড়া রীতিমতো উত্তপ্ত। সম্পূর্ণ বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ বিষয় হওয়া সত্ত্বেও সব ধরনের কূটনৈতিক সৌজন্যের বিপরীতে গিয়ে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এই হিন্দু নেতাকে গ্রেফতারের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দিয়েছে। বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ও তাৎক্ষনিক ভারতের এই বিবৃতির কড়া সমালোচনা করে পাল্টা বিবৃতি প্রকাশ করেছে। সব মিলিয়ে দক্ষিণ এশিয়ার এই দুই প্রতিবেশী দেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্কে বড় ধরনের ছন্দপতন হয়েছে জনৈক হিন্দু নেতাকে গ্রেফতারের কারণে। বাংলাদেশের অভ্যন্তরেও এই ঘটনার প্রেক্ষিতে সন্ত্রাসবাদী এই হিন্দু নেতার সমর্থকদের হাতে একজন সরকারি আইন কর্মকর্তার মৃত্যুসহ আরো অনেক উত্তাপ ছড়িয়েছে।

কবিতা

আমরা সেই সে জাতি
কাজী নজরুল ইসলাম

ধর্মের পথে শহীদ যাহারা আমরা সেই সে জাতি
সাম্য-মৈত্রী এনেছি আমরা বিশ্বে করেছি জ্ঞাতি।।
আমরা সেই সে জাতি

পাপ-বিদগ্ধ তৃষিত ধরার লাগিয়া আনিল যাঁরা
মরুর তপ্ত বক্ষ নিঙাড়ি শীতল শান্তি-ধারা
উচ্চ-নীচের ভেদ ভাঙি দিল সবারো বক্ষ পাতি'।।
আমরা সেই সে জাতি

কেবল মুসলমানের লাগিয়া আসেনি'ক ইসলাম
সত্যে যে চায় আল্লায় মানে মুসলিম তারি নাম
আমির ফকিরে ভেদ নাই — সবে ভাই, সব এক সাথি।।
আমরা সেই সে জাতি

নারীরে প্রথম দিয়াছি মুক্তি, নর সম অধিকার
মানুষের গড়া প্রাচীর ভাঙিয়া করিয়াছি একাকার।
আধার রাতির বোরখা উতারি এনেছি আশার-ভাতি।।
আমরা সেই সে জাতি

তুমি দেখাও পূর্ণতার বিজয়
খালেক বিন জয়েন উদ্দীন

জীর্ণ ভুবনের করুণ দশা
কূলে বাঁধা শক্ত কাঠের তরীতে বিদীর্ণ হাওয়া
আকাশপানে ছুটছে কেমন
আমাদের ঘর-গেরস্থিতে দীর্ঘ দিবসের দুঃখ।

অন্তবিহীন এই শ্যামল পৃথিবী
তাপ ও জরার মরণ মহোৎসবে নিশিদিন মেতেছে
চতুর্দিকে দ্যুতির বদলে অন্ধকার
মনুষ্য শরণিতে– ভয়ার্ত ও অশান্তির কালো ছায়া।

এই দুঃখের শূন্য তিমিরে
তুমি দেখাও পুণ্যতার বিজয় এবং দীপজ্বালা মুক্তির পথ
অসীম ব্যাকুলতার স্বপ্ন-সাধনায়
আবার ফুটে উঠুক বিশ্বজগতের জন্য বাণীর কুসুমকলি।



মালি

মুহাম্মাদ উসমান গণি

প্রভাবশালী বাদশাহ। লোক লশকর আর পাইক-পেয়াদায় জমজমাট রাজপ্রাসাদ। তিনি বসেন উঁচু আসনে। হুকুম তামিল করার জন্য সদা প্রস্তুত একঝাঁক হুকুম বর্দার সশস্ত্রবাহিনী। এভাবেই চলছে রাজ্য। রাজার আরাম-আয়েসী জীবনযাপন আর আমোদ-প্রমোদের কোনো শেষ নেই। রাজার কপালে নেই কোনো চিন্তার ভাঁজ। কিন্তু হঠাৎ কী থেকে কী হয়ে গেল। রাজা স্বেচ্ছায় রাজ্য ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে বসলেন। সমগ্র রাজ্যের মানুষ আশ্চর্য! ব্যাপার কী?

যে আসনে কেউ বসলে টেনেও নামানো যায় না, চিরজীবন থাকতে চায়। অথচ এই রাজা কি না স্বেচ্ছায় সিংহাসন ত্যাগ করতে চান। সবাই ছুটে গেল রাজদরবারে। বাদশাহকে বিভিন্নভাবে অনুনয়বিনয় করতে লাগলো প্রজা সাধারণ। কিন্তু তিনি তার সিদ্ধান্তে অটল। রাজ্য তিনি ত্যাগ করবেনই। তিনি আর রাজা হয়ে থাকতে চান না। তিনি খুঁজতে চান রাজাধিরাজ যিনি তাকে এই আসনে বসালেন। খুঁজে পেতে চান মহান মালিক মাওলাকে। সবার আবদারকে উপেক্ষা করে অবশেষে ফকীরবেশে বেরিয়ে পড়লেন রাস্তায়। চললেন অজানার দিকে। খুঁজতে লাগলেন একজন আধ্যাত্মিক গুরু। এভাবে চলতে চলতে পেয়েও গেলেন একদল সূফীদের সন্ধান। যারা অনেক আগেই সবকিছু ত্যাগ করেছেন। তিনি তাদের কাছে গেলেন। উপদেশ গ্রহণ করলেন। জানতে চাইলেন হালাল রিযকের সন্ধান। তাঁরা বললেন, তুমি শাম দেশে চলে যাও। সূফীদের কথায় তিনি চলে গেলেন শাম দেশে। সেখানে গিয়ে অনাহারে অর্ধাহারে দিনযাপন করছেন কিন্তু কোনো কাজের সন্ধান পাচ্ছিলেন না। হঠাৎ একদিন একদল সূফীর সাথে দেখা হয়ে যায় তাঁর। তাদেরকে তিনি কোনো কাজের সন্ধান দিতে অনুরোধ করলে তারা তাঁকে তুরসুস নগরীতে যাওয়ার পরামর্শ দিলেন। তিনি এবার চলে গেলেন তুরসুস নগরীর বাবুল বাহর নামক স্থানে। সেখানে তিনি বের হলেন কাজের সন্ধানে। অনেক কাঠখড়ি পুড়ানোর পর একটি কাজের ব্যবস্থা হলো। দায়িত্ব পেলেন একটি বাগানের মালির। তিনি বাগানের দায়িত্ব পেয়ে কাজ শুরু করলেন। এভাবেই চলতে লাগলো আরো বেশ কিছুদিন। হঠাৎ একদিন বাগানের মালিক একদল অতিথি নিয়ে বাগানে হাযির। মালিক এসেই তাকে ভালো দেখে কিছু আনার ফল নিয়ে আসতে বললেন। তিনি তরতাজা দেখে কিছু আনার নিয়ে আসলেন। মালিক আনার মুখে দিয়ে দেখলেন ভীষণ টক।

তিনি খুব বিরক্ত হলেন এবং মালিকে কঠিন ভাষায় ভর্ৎসনা করে বললেন, তুমি এতোদিন যাবৎ এ বাগানের দায়িত্বে আছো অথচ কোন ফল টক আর কোনগুলো মিষ্টি তাই জানো না, এ কেমন দায়িত্ব পালন করছো?

তিনি খুব বিনয়ের সাথে বললেন, আমি তো বাগান পাহারা দেওয়ার দায়িত্ব নিয়েছি, বাগানের ফল খাওয়ার দায়িত্ব তো পাইনি। মালিক উত্তর শুনে একদম থ হয়ে গেলেন। অতিথিদের উদ্দেশ্য করে বললেন, মালি যা উত্তর দিয়েছে, এই জায়গায় যুগের সূফী ইবরাহীম আদহাম থাকলে একই উত্তর দিতেন। অথচ, বাগানের মালিক কিংবা অতিথি কেউই বুঝতে পারলো না এই লোকটিই তৎকালীন যুগের শ্রেষ্ঠ সূফী ইবরাহীম ইবন আদহাম। একথা শুনে ইবরাহীম আদহাম দ্রুত সেখান থেকে কেটে পড়লেন, না জানি তাকে কেউ চিনে ফেলে। পরদিন মালিক অনেক লোকসহ বাগানের দিকে আসছেন, তিনি মনে মনে ভাবলেন এরা হয়তো গতদিন তাঁকে চিনে ফেলেছেন। সবাই যখন বাগানে প্রবেশ করলো, সাথে সাথে তিনি লোকের ভিড়ে মিশে গেলেন এবং কাউকে কিছু না বলেই এ শহর থেকে অন্য শহরে চলে গেলেন।

বনী ইসরাঈলের গাভী যবাই

জামান আহমদ

বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়ের একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিল। যার একটিমাত্র মেয়ে। মেয়েটি ছিল সেই সম্পদের একমাত্র উত্তরাধিকারিণী। ধনাঢ্য ব্যক্তির একজন ভাতিজা ছিল, যে সব সময় সেই মেয়েকে বিয়ে করে বিশাল সম্পত্তি হাতিয়ে নেওয়ার নানান পায়তারা করত। হঠাৎ একদিন সকালে দেখা গেল পাশ্ববর্তী শহরের প্রবেশদ্বারে ওই ধনাঢ্য ব্যক্তির লাশ পড়ে আছে। উল্লেখ্য যে, পাশাপাশি দুই শহরে বসবাস করা বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়ের নিয়ম ছিল, কোনো নিহত ব্যক্তির লাশ দুই শহরের মধ্যবর্তী স্থানে পাওয়া গেলে এবং হত্যাকারীর কোনো সন্ধান না পেলে উক্ত লাশটি যে শহরের অধিকতর নিকটে থাকবে সেই শহরের বাসিন্দাগণ নিহত ব্যক্তির আত্মীয়স্বজনকে সমস্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

নিহত লোকটির ভাতিজা পাশ্ববর্তী শহরে বসবাসকারী সম্প্রদায়ের উপর হত্যার অভিযোগ আনলে তারা তা অস্বীকার করে বললো, আল্লাহর কসম! আমরা তাকে হত্যা করিনি এবং কে হত্যা করেছে তাও আমরা জানি না। ফলে, উভয়পক্ষের মধ্যে তুমুল ঝগড়া শুরু হওয়ার উপক্রম দেখা দিল। গোত্রের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ বললেন, লোকটাকে কে হত্যা করেছে তার কোনো সুস্পষ্ট প্রমাণ তোমাদের কারোর কাছে নাই। তবুও কেন তোমরা পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে মারামারিতে লিপ্ত হচ্ছ? আমাদের মধ্যে আল্লাহর নবী মূসা (আ.) বিদ্যমান আছেন। আমরা তার কাছে গিয়ে সমস্ত ঘটনা খুলে বলবো, তিনিই এর একটা বিহিত করে দেবেন। উভয়পক্ষ এই সিদ্ধান্তে রাযি হলো। মূসা (আ.) এর কাছে বিস্তারিত ঘটনা খুলে বলার পর তিনি হত্যাকারীর পরিচয় জানার জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলেন। আল্লাহ পাক বনী ইসরাঈলকে একটি গাভী যবাই করার আদেশ দিলেন এবং বললেন, সেই যবাইকৃত গাভীর এক টুকরো গোশত নিহত ব্যক্তির শরীরে স্পর্শ করলে সে জীবিত হয়ে তার হত্যাকারীর নাম বলবে। একথা শুনে বনী ইসরাঈল সম্প্রদায় অবাক হয়ে বললো, হে মূসা (আ.), আপনি কি আমাদের সাথে উপহাস করছেন? তিনি বললেন, এটা আল্লাহর আদেশ। এ প্রসঙ্গে কুরআনে এসেছে, "স্মরণ করো যখন মূসা (আ.) তার কওমকে বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে একটি গাভী যবাই করার নির্দেশ দিয়েছেন। তারা বললো, আপনি কি আমাদের সাথে তামাশা করছেন? মূসা (আ.) বললেন, আমি জাহিলদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।।" (সূরা বাকারা: আয়াত ৬৭)

নিরুপায় হয়ে বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়ের লোকেরা গাভী যবাই করার সিদ্ধান্ত মেনে নিল বটে কিন্তু তারা গাভীর ধরণ সম্পর্কে নানান প্রশ্ন শুরু করলো। "তারা বললো, আপনার রবকে বলুন, তিনি যেন গাভীর পরিচয় প্রদান করেন। সে বললো– আল্লাহ বলেছেন, গাভীটি না বৃদ্ধা না যুবতি বরং মাঝামাঝি বয়সের হবে। সুতরাং তোমাদের আদিষ্ট কাজ সম্পন্ন কর।" (সূরা বাকারা: আয়াত ৬৮)

"তারা বললো, আপনার রবকে বলুন, তিনি যেন আমাদেরকে গাভীর রঙ বলে দেন। তিনি (মূসা আ.) বললেন– আল্লাহ বলেছেন, গাভীটি হবে হলুদাভ রঙের। যেন দর্শকদের প্রাণ জুড়িয়ে যায়। (সূরা বাকারা: আয়াত ৬৯)

"তারা (আবার) বললো, আপনার রবকে বলুন, তিনি যেন আমাদেরকে গাভীর (পরিপূর্ণ) পরিচয় প্রদান করেন। নিশ্চয়ই গাভীটির পরিচয় আমাদের কাছে অস্পষ্ট রয়েছে। অত:পর, ইনশাআল্লাহ আমরা অবশ্যই ঠিক পেয়ে যাব। (সূরা বাকারা: আয়াত ৭০)

মূসা (আ.) বললেন, "নিশ্চয়ই তিনি (আল্লাহ) বলেছেন, গাভীটি এমন হতে হবে যেটি কৃষিকাজে ব্যবহৃত হয়নি এবং সেটা দ্বারা সেচ কার্য করা হয়নি। সেটি হবে সুস্থ, সবল, সবদিকে দাগ-খুঁত মুক্ত। তারা বললো, এতক্ষণে আপনি সঠিক কথা বলেছেন। অত:পর, তারা সেটি যবেহ করলো অথচ তারা এটা করার ধারে-কাছেও ছিল না।" (সূরা বাকারা: আয়াত ৭১)

যাইহোক, তারপর তারা উদ্দিষ্ট গাভীটির সন্ধানে বের হলো কিন্তু অনেক খোঁজাখুঁজি করার পরও কোথাও তারা কাঙ্ক্ষিত গাভীটি পেল না। বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়ের মধ্যে পিতৃভক্ত একটি লোক ছিল। পিতৃভক্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ায় আল্লাহ পাক তাকে পুরস্কারস্বরূপ একটি গাভী দান করেছিলেন। সেই গাভীটির মধ্যেই বনী ইসরাঈলের তালাশকৃত গাভীটির সকল বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান ছিল। লোকেরা খুঁজতে খুঁজতে একদিন তার বাড়িতে এসে পৌঁছলো এবং গাভীটির মধ্যে তারা সেসকল বৈশিষ্ট্য দেখতে পেলো যা আল্লাহ পাক বলে দিয়েছিলেন। তারা গাভীটি কিনতে চাইলে সে জানালো, গাভীটি বিক্রি করবে না। তারা বললো, গাভীটি আমাদের দিয়ে দাও বিনিময়ে আমরা তোমাকে আরও দুটি ভালো গাভী দেব কিন্তু সে রাজি হলো না। দুইটি, দশটি, বিশটি করে বাড়তে বাড়তে তারা একশোটি গাভী দেওয়ার প্রস্তাব করলো কিন্তু তাতেও লোকটি রাজি হলো না। তারা তখন সুপারিশ করার জন্য মূসা (আ.)-এর শরণাপন্ন হল। তিনি লোকটিকে গাভীটি বিক্রি করার জন্য বললেন। সে বললো, হে আল্লাহর নবী! যেহেতু গাভীটির মালিক আমি অতএব এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ইখতিয়ারও শুধুমাত্র আমার। মূসা (আ.) বললেন, তুমি ঠিকই বলেছ। বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়ের লোকদিগকে বললেন, তোমরা যেভাবেই পারো তাকে সন্তুষ্ট করে গাভীটি ক্রয় কর। তখন তারা গাভীটির সমপরিমাণ স্বর্ণ দেওয়ার প্রস্তাব দিলো কিন্তু লোকটি সম্মত হলো না। অগত্যা স্বর্ণের পরিমাণ বাড়াতে বাড়াতে দশগুণ সমপরিমাণ স্বর্ণ দিয়ে তারা গাভীটি কিনতে সক্ষম হল।

অবশেষে কাঙ্ক্ষিত গাভীটিকে যবাই করে সেটির এক টুকরো গোশত নিহত ব্যক্তির শরীরে স্পর্শ করার সাথে সাথেই লোকটি পুনর্জীবিত হল! উপস্থিত লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, কে তোমাকে হত্যা করেছে? সে বললো- আমার মেয়েকে জোরপূর্বক বিয়ে করে আমার সমস্ত সম্পদ আত্মসাৎ করার জন্য আমার ভাতিজা আমাকে হত্যা করেছে। একথা বলেই লোকটি আবার মারা গেল। এটা শুনে বনী ইসরাঈল সম্প্রদায় ভাতিজাকে খুনি সাব্যস্ত করে মৃত্যদণ্ড প্রদান করলো।

[উল্লিখিত ঘটনায় সূরা বাকারার আয়াতসমূহ লক্ষ্য করলে দেখা যায়, বনী ইসরাঈল সম্প্রদায় মূসা (আ.)-কে হয়রান ও নাজেহাল করার উদ্দেশ্যে গাভীটি সম্পর্কে অহেতুক প্রশ্ন উত্থাপন করে একটি সহজ বিষয়কে নিজেদের জন্য কষ্টকর বানিয়ে নিলো। অথচ, আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী তারা যে-কোনো একটি গাভী যবাই করলেই তাদের উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে যেত।]

শ্বাসরুদ্ধকর গোয়েন্দা অভিযান

যুবাইর মাবরুর

মদীনার ইয়াহুদীদের মধ্যে অন্যতম ছিল বনূ নাদ্বীর (নাযীর)। রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনায় হিজরত করার পর তাদের সাথে শান্তিচুক্তি হয়। যে চুক্তির অধীনে মদীনায় মুসলমান এবং ইয়াহুদী পরস্পর শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করে আসছিলেন । ইসলামের সামগ্রিক উত্থান হিংসুক ইয়াহুদীদের বেশিদিন সহ্য হয়নি। রাসূলুল্লাহ ﷺ কে হত্যার ষড়যন্ত্র থেকে শুরু করে বিভিন্ন অপরাধে তারা জড়িয়ে পড়ে। যার দরুণ তাদেরকে মদীনা থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল। বনূ নাযীরকে মদীনা থেকে বের করে দেওয়ার পর তারা খাইবারে গিয়ে বসবাস শুরু করে। তাদের এক লোক ছিল প্রবল প্রভাবশালী এবং ধনী। সম্পদের জন্য দেশ-বিদেশে তার বিরাট খ্যাতি ছিল। তার নাম ছিল আবূ রাফি আব্দুল্লাহ ইবন আবী হুকাইক। সে প্রথমে মক্কার কুরাইশদের সাথে গোপনে আঁতাত করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে। কুরাইশরা মুসলমানদের কাছে গো হারা হারার পরও তার ষড়যন্ত্র থেমে যায়নি। শেষ পর্যন্ত আহযাব যুদ্ধের (খন্দক) সময় কুরাইশ মিত্র বাহিনীকে অর্থায়ন করে। এ যুদ্ধের পরে সে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে 'মোস্ট ওয়ান্টেড' ক্রিমিনাল হয়ে যায়।

শুরু হয় তাকে হত্যা করার সেই শ্বাসরুদ্ধকর গোয়েন্দা অভিযান। রাসূলে পাক ﷺ ছোট্ট একটা কাফেলা পাঠালেন তাকে হত্যা করার জন্য। কাফেলার নেতৃত্ব দিলেন আব্দুল্লাহ ইবন আতিক (রা.)-এর হাতে। বিরাট বিত্তশালী হওয়ায় হিজাযে তার একটি অজেয় দূর্গ ছিল। সে দূর্গেই সে দিনাতিপাত করতো। সাহাবায়ে কিরামের দল যখন সেখানে গিয়ে পৌঁছলেন ততক্ষণে পশ্চিমাকাশে সূর্য হেলে পড়েছে। দিনের আলো নিভুনিভু । একটু পরেই নামবে রাতের অন্ধকার। সারাদিন মাঠে পশু চড়িয়ে ক্লান্ত রাখাল তার পশুর পাল নিয়ে ঘরে ফিরছে। ঠিক সেই সময় তারা দূর্গের প্রধান ফটকের অনতিদূরে গিয়ে দাঁড়ালেন। গোয়েন্দা দলের প্রধান আব্দুল্লাহ ইবন আতিক (রা.) তাঁর টিমের সদস্যদেরকে নির্দেশনা দিলেন সেখানেই লুকিয়ে থাকার জন্য। তিনি একা অভিযান পরিচালনার সিদ্ধান্ত নিলেন, যাতে চুপিচুপি সবার অজান্তে কাজ শেষ করে বের হওয়া যায়। সিদ্ধান্ত নিলেন আজ রাতের মধ্যেই মিশন সফলতার সাথে শেষ করবেন।

গোয়েন্দা প্রধান ধীরপদে দূর্গের সদর দরজার পাশে গিয়ে দাড়ালেন। ওঁত পেতে থাকলেন কখন সুযোগ আসে। কেউ যাতে তাঁকে চিনতে না পারে সেজন্য তিনি নিজেকে আপাদমস্তক ঢেকে এমনভাবে বসে পড়লেন যেন দেখে মনে হয় তিনি প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারছেন। হঠাৎ শোরগোল শুনে একটু কান পেতে শুনেন, তারা তাদের একটা গাধা হারিয়ে ফেলেছে এবং সেটা খুঁজতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। ঠিক এমন সময় গেইটের দারোয়ান হাঁক ছেড়ে বললো, এখনো যদি কেউ বাইরে থেকে থাকো তাহলে খুব দ্রুত দূর্গে প্রবেশ করো; এখনই দরজা বন্ধ করে দেবো। এই তো সুযোগ! সুযোগ পেয়ে সবার সাথে মিশে গিয়ে জলদি জলদি তিনিও দূর্গে ঢুকে যান। দূর্গে প্রবেশ করে তিনি সদর দরজার পাশেই গাঁধা বেঁধে রাখার জায়গায় ঘাপটি মেরে বসে থাকেন। দারোয়ান দরজা লাগিয়ে চাবি রাখার স্থানে চাবিটা রেখে চলে গেল। দারোয়ান চলে যাবার সাথে সাথেই সুযোগ বুঝে তিনি চাবিটা নিয়ে নেন।

দূর্গজুড়ে রাত্রিকালীন আড্ডা শুরু হলো। বেশ খানিক্ষণ চললো তাদের শোরগোল। ধীরে ধীরে দূর্গজুড়ে নীরবতা নেমে আসতে শুরু করলো। একে একে সবাই নিজের ঘরে চলে যেতে লাগলো। সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আবূ রাফিও নিজের ঘরে চলে গেল। সে জানে না আজ রাতে তার জন্য কী অপেক্ষা করছে। রাত গভীর হতে শুরু করলো। সুখ নিদ্রায় তলিয়ে গেল পুরো দূর্গের মানুষ। দরজার পাশে ঘাপটি মেরে থাকা গোয়েন্দা প্রধান নিঃশব্দে বেরিয়ে আসলেন। চাবি দিয়ে দূর্গের মূল গেইট হালকা করে খুলে রাখলেন যাতে পালিয়ে যাওয়ার সময় কোন বেগ পেতে না হয়। দূর্গের ভিতরে যত ঘর ছিল সব ঘরের দরজা বাইরে থেকে লাগিয়ে দিলেন যাতে শব্দ শুনে কেউ নিজের ঘর থেকে সহজে বের হতে না পারে। আবূ রাফি যে ঘরে থাকতো সে ঘরটি ছিল দু'তলা। সে দ্বিতীয় তলায় তার পরিবারের সাথে থাকতো। গোয়েন্দা প্রধান আব্দুল্লাহ (রা.) সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে শব্দহীনভাবে উপর তলায় গিয়ে পৌঁছলেন।

আবূ রাফি তার সন্তান-সন্ততির সাথে একই রুমে ঘুমাতো। অভ্যাসমতো সে রাতেও তাদের সাথেই ঘুমিয়েছে। ঘরের সমস্ত আলো নিভিয়ে দেওয়ায় ঘর ছিল নিঝুম অন্ধকার। কিছুই দেখা যাচ্ছিলো না। আব্দুল্লাহ (রা.) বিভিন্ন কায়দা-কসরত করেও তাকে চিনতে পারছিলেন না। শেষমেষ একটা ফন্দি আঁটলেন। তাকে চেনার জন্য তার নাম ধরে ডাক দিলেন— আবূ রাফি! কে এখানে? কে ডাকছে আমাকে? তার আওয়াজ লক্ষ্য করে সেদিকে এগিয়ে গিয়ে প্রবল বেগে তলোয়ার দিয়ে আঘাত করলেন। কিন্তু বিফল হলেন। আঘাত লক্ষ্যচ্যুত হয়ে গেল। আবূ রাফি চিৎকার করে উঠলো। সাথে সাথে তিনি তার রুম থেকে বের হয়ে আসলেন। এবার প্ল্যান বদলে ফেললেন গোয়েন্দা প্রধান আব্দুল্লাহ (রা.)। তার রুমে আবার প্রবেশ করে তিনি এমন ভাব করলেন যেন তিনি তাকে সাহায্য করতে এসেছেন। নিজের গলার স্বর পরিবর্তন করে তাকে অভয় দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কী হয়েছে তোমার আবূ রাফি? তার কোন চাকর তাকে সাহায্য করতে এসেছে ভেবে সে জবাব দিলো, কী সর্বনাশের কথা! আমার ঘরে ঢুকে কে যেন আমাকে হত্যা করতে চাচ্ছে! আব্দুল্লাহ (রা.) তার আওয়াজ আন্দাজ করে আবার আঘাত করলেন। এবারও ব্যর্থ হলেন কিন্তু তরবারির আঘাতে সে ধরাশায়ী হয়ে যায়। সে আরো জোরে চিৎকার করে উঠলো। এবার তার পরিবারের বাকি লোকগুলোও জেগে উঠলো। তিনি আবার তার গলার স্বর পরিবর্তন করে তাকে অভয় দিতে দিতে তার একেবারে কাছে গিয়ে দেখেন আঘাতে জর্জরিত হয়ে সে চিত হয়ে শুয়ে কাতরাচ্ছে। আব্দুল্লাহ (রা.) তাঁর তরবারি সোজা করে আবূ রাফির পেট দিয়ে ঢুকিয়ে পিট দিয়ে বের করে দেন। তখন তিনি নিশ্চিত হন যে তাকে পুরোপুরি শেষ করতে পেরেছেন।

এবার সেখান থেকে বের হওয়ার পালা। আবূ রাফির রুম থেকে বের হয়ে তাড়াহুড়ো করে সিঁড়ি বেয়ে তিনি নিচে নামতে থাকেন। নামতে নামতে শেষ ধাপে এসে তিনি সিঁড়ি শেষ মনে করে পা দিতেই মাটিতে পড়ে যান । সে রাত ছিল ভরা পূর্ণিমা। চাঁদের আলোতে সিঁড়ির ছায়া দেখে তিনি মাটি মনে করেছিলেন। মাটিতে পড়ে গিয়ে তাঁর পা ভেঙে যায়। তড়িঘড়ি করে মাথার পাগড়ি খুলে পা বেঁধে ফেলেন। ধীরে ধীরে ভাঙ্গা পা নিয়ে শুরুতেই খুলে রাখা দরজা দিয়ে বের হয়ে তিনি তার টিমের বাকি সদস্যদের সাথে দেখা করেন। তাদেরকে সুসংসবাদ দিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে পাঠিয়ে দিয়ে তিনি সেখানেই সকাল হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে থাকেন। নিজ কানে তার মৃত্যু সংবাদ শুনে যাওয়ার মনস্থির করেন । ভোরের সোনালি আলো ফুটে উঠলো। মোরগ হাঁক ছেড়ে জানান দিল সকাল হয়ে গেছে। একজন ঘোষক দেয়ালের উপরে উঠে ঘোষণা দিল— "হিজাযের অন্যতম ব্যবসায়ী আবূ রাফি গতরাতে নিহত হয়েছেন"। ঘোষণা শুনে শান্ত মনে ঘোড়া ছুটালেন পাক মদীনার দিকে। সফলতম অভিযানের গল্প প্রিয়তম নবীজিকে শুনানোর পরম আকাঙ্ক্ষা বুকে নিয়ে।

পাক মদীনায় গোয়েন্দা দল উপস্থিত। একটা সফলতম অভিজান শেষ করে গোয়েন্দা প্রধান সোজা হাযির দরবারে রিসালাতে প্রিয়তম নবীজির অবমাননাকারীকে চূড়ান্ত শাস্তি দিতে পারার অনাবিল সুখ নিয়ে। মসজিদে নববীতে খেজুর পাতার ছায়ায় বসে আছেন প্রিয়তম নবীজি। নবীজির দরবারে হাযির হয়ে গতরাতের পুরো ঘটনা বর্ণনা দিচ্ছেন আব্দুল্লাহ ইবন আতিক (রা.)। নবীজি আনন্দিত হলেন। বললেন, তোমার ভাঙা পা লম্বা করে দাও। আব্দুল্লাহ (রা.) তাঁর পা লম্বা করে দিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের মুবারক হাতের পরশ বুলিয়ে দিলেন তাঁর ভাঙা পায়ে। সাথে সাথে তাঁর পা এমনভাবে ভালো হয়ে গেল যেন সেটা কখনো ভাঙ্গে-ই নি।

আবু সাঈদ
মোহাম্মদ খছরুজ্জামান

আবু সাঈদ মানে
বুলেটের মুখে বুক পেতে দাঁড়ানো
আবু সাঈদ মানে
স্বাধীন রাষ্ট্র হতে স্বৈরাচার তাড়ানো।

আবু সাঈদ মানে
অধিকার আদায়ে রাজপথ কাঁপানো
আবু সাঈদ মানে
জবরদখলকারীর হৃদয় ভীতিতে হাঁপানো

আবু সাঈদ মানে
জীবনের বিনিময়ে স্বৈরাচারের পলায়ন
আবু সাঈদ মানে
স্বাধীন দেশে আবার নতুন স্বাধীনতা আনয়ন।

প্রাণের বাংলাদেশ
ইয়াহইয়া আহমদ চৌধুরী

লাখ শহীদের রক্তে কেনা
বাংলাদেশের মাটি
সবুজ শ্যামল গাছগাছালি
কী যে পরিপাটি।

মাঠ ভরা ঐ সবুজ ধান আর
নদী ভরা মাছ
প্রাণ জুড়ানো মন ভুলানো
ফুল ও ফলের চাষ।

আউলিয়াদের চারণভূমি
আমার বাংলাদেশ
তাদের দেয়া দীক্ষাতে হয়
এমন পরিবেশ।।

এদেশ মাটির জন্য যারা
প্রাণ দিয়েছে ভাই
স্বাধীনতার মাসে তাঁদের
স্মরণ করে যাই।

তাদের প্রতি রইলো মোদের
দুআ অনিঃশেষ
বিশ্ব মাঝে হোক উঁচু শির
প্রাণের বাংলাদেশ।

সময়ের আক্ষেপ-১০
এস এম মনোয়ার হোসেন

হেলায় খেলায় দিন কেটে যায়
যায় ফুরিয়ে বেলা
অমনি সুখে ফুরাবে কি
এই জীবনের খেলা।

ভুল করে ভুল পথে হেঁটে
করছি হাজার পাপ
বেলা শেষের আগে আমি
পাবো কি গো মাফ?

সুখ প্রবাহে বুঝি সময়
হাজার দ্বিধা-দ্বন্দ্বে
ভালো ফিকির দূরেই থাকে
মত্ত শুধুই মন্দে।

জীবন যুদ্ধে মানুষগুলো
ভুলটা যে নেয় বুঝে
ভালোর স্বপ্নে বিভোর যাঁরা
আলোর পথটা খুঁজে।

ভুল হওয়াটাই সহজাত
জীবন মরণ গ্লানি
ঈমান শ্রেষ্ঠ নেয়ামত যে
লভিতে স্মরি গো বাণি।

শেষ বিদায়ে চাই হে খোদা
কেবল তোমার দয়া
গোনাহগার এ বান্দা আমি
চাই গো তোমার মায়া।

নিষ্পাপ মুনতাহা
হামিদ মাহমুদ

মুনতাহা নামের ছোট্ট শিশু
কী বা এমন করে
পাশের বাড়ির খুনির হাতে
প্রাণটি গেলো ঝরে।

ফুটফুটে এক সুন্দর শিশু
মায়ের খালি বুক
বাবার ভিতর জ্বালাপোড়া
প্রবাস ভাইয়ের দুখ।

ভাইয়ের মনে স্বপ্ন ছিল
প্রিয় বোনকে নিয়ে
এর বিনিময় সবই দিবো
দাও যদি ফিরিয়ে।

মারজিয়া নামের মহিলার
কঠিন বিচার চাই
তাদের তরে আইন ক্ষমতা
সঠিক যেন পাই।

তুমি মুসলমান
এম শামছুল ইসলাম সুহেব

জান্নাতের তামান্না যদি বুকে সদা রাখো
তবে কেন আমল থেকে দূরে সরে থাকো?
সৎকাজে সদা কেন আটকায় শয়তান?
ভুলে কেন যাও হে বন্ধু! তুমি মুসলমান।

রিক্ত হস্তে যেতে হবে ভয়াল কবর ঘরে
স্বাদের বাড়ি, টাকা-পয়সা সবই রবে পড়ে
আমিত্ব সব বিলীন হবে থাকবে না কোন কিছু
এসব জেনেও ছুটো কেন পাপের পিছু পিছু?

আল্লাহ পাকের সৃষ্টি মাঝে হয়েও সবার সেরা
চলো কেন ভুল পথে তাঁর হুকুম-আহকাম ছাড়া?
হরহামেশা লোভ-লালসায় করো যতো পাপ
খাস নিয়তে করলে দুআ করেন তিনি মাফ।

মনের ভেতর থাকে যদি হিংসা-নিন্দার খনি
কেমনে হবে দু'জাহানে নেক আমলের ধনী?
দয়ার পরশ পেতে হলে রবের তরফ থেকে
জীবনটাকে সাজাও তবে নেক আমলে মেখে।

ঈমান খাঁটি করতে হলে ধরো সঠিক পথ
হৃদয় থেকে ছুঁড়ে ফেলো ভ্রান্ত সকল মত
মাবূদ আল্লাহ ক্ষমা করো বলো দু'হাত তুলে
করেছি কত গুনাহ আমি জেনে-শুনে ভুলে।

রক্ত দিয়ে কেনা
গোলাপ মাহমুদ সৌরভ

রক্ত দিয়ে কেনা হলো
সুন্দর একটি দেশ
মুক্তিযুদ্ধ শেষে পেলাম
স্বাধীন বাংলাদেশ।

মুক্ত আকাশ, পতাকা উড়ে
বিদ্যালয়ের মাঠে
আজও শহীদের রক্ত ভাসে
খেয়া পাড়ের ঘাটে।

একাত্তরের কালো দিন সব
আজও চোখে ভাসে
পাকবাহিনীর থাবা থেকে
বিজয় ফিরে আসে।

ষোলো ডিসেম্বর এলেই মোরা
স্মরণ করি তাঁদের
কোনদিনই শোধ হবেনা
বিজয় অর্জন যাঁদের

কুরআন কারীমের অজানা কিছু তথ্য



আল কুরআন মহান আল্লাহ তাআলার এক বিস্ময়কর কালাম। মানুষ সারা জীবন গবেষণা করেও এর সামান্য মর্মার্থ উদ্ধার করতে সক্ষম। সম্প্রতি তুরস্কের পত্রিকা 'জামান' আল কুরআন সম্পর্কে কয়েকটি বিস্ময়কর তথ্য তুলে ধরেছে। জেনে নেয়া যাক কয়েকটি তথ্য-

★ পবিত্র কুরআনে শাস্তি শব্দটি আছে মোট- ১১৭ বার ও ক্ষমা আছে মোট- ২৩৪ বার। শাস্তির চেয়ে ক্ষমার ঘোষণা দ্বিগুণ (১১৭ x ২)= ২৩৪ বার। এটার দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে, আল্লাহ শাস্তির চেয়ে দ্বিগুণ ক্ষমা করে থাকেন ।

★ 'আল্লাহ তাআলা বললেন' শব্দটি এসেছে -৩৩২ বার। 'তারা বলল' শব্দটি- ৩৩২ বার। অর্থাৎ মানুষ যতবার প্রশ্ন করেছে, আল্লাহ ততবারই উত্তর দিয়েছেন।

★ নারী বা মহিলা শব্দটি- ২৩ বার। পুরুষ শব্দটি- ২৩। এটা দ্বারা বোঝা যায়, আল্লাহ তাআলার নিকট নারী-পুরুষ সমান। এছাড়াও একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হল- উভয়ের যোগফল (২৩+২৩=৪৬) হয়। আমরা জানি, একটি শিশু জন্মগ্রহণ করে, ৪৬টি ক্রোমোজোম নিয়ে, যার ২৩টি আসে পিতা থেকে আর ২৩টি আসে মাতা থেকে।

★ পবিত্র কুরআনে স্থল শব্দটি এসেছে- ১৩ বার। সাগর- ৩২ বার। সাধারণত এটা দ্বারা তেমন কিছু বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু, আমরা যদি এর যোগফল দেখি, তাহলে হবে (১৩ + ৩২ = ৪৫)। যদি ১৩ দিয়ে যোগফল ৪৫ এর সঙ্গে ভাগ করি, তাহলে হয় (১৩ ÷ ৪৫% = ২৮.৮৮) এবং ৩২ দিয়ে যোগফল ৪৫ এর সঙ্গে ভাগ করি, তাহলে হয় (৩২ ÷ ৪৫% = ৭১.১১)। বিজ্ঞানীরা কয়েক বছর পূর্বে বের করেছেন যে, পৃথিবীতে স্থলভাগের পরিমাণ ২৮.৮৮ ভাগ এবং পানির পরিমাণ ৭১.১১ ভাগ।

★ পৃথিবীর কয়েকটি স্তর রয়েছে। একদম মাঝের স্তরটির মূল উপাদান হলো লোহা। আল-কুরআনে মোট ১১৪টি সূরা রয়েছে। ১১৪ এর অর্ধেক হলো ৫৭। আর ৫৭ নং সূরাটির নাম হচ্ছে আল-হাদীদ যার অর্থ লোহা।

গ্রন্থনাঃ মোহাম্মদ সিদ্দীক হায়দার

বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবী শব্দ

১২৬. ضَرٌّ (দার): আঞ্চলিক বাংলা **জর**। ক্ষতি, বিষ, বিষাক্ত, Poison.

১২৭. ضَالٌّ (দাল): বাংলারূপ **জাল**। অসত্য, বানোয়াট, Duplicate. যেমন- জাল দলিল, জাল সার্টিফিকেট, জাল ভাউচার।

১২৮. ضَالِّيَّةٌ (দাল্লিয়্যাহ): বাংলারূপ **জালিয়াতি**। বানোয়াট, Duplicate.

১২৯. ضَيْعٌ (দাই): আঞ্চলিক বাংলা **জায়**। নষ্ট, ধ্বংস, Spoil.

১৩০. ضَيْعَةٌ (দাইআহ): বাংলারূপ **জোত**। চাষের জমি, উর্বর ভূমি, Cultivation. যেমন- পাহাড়ী জোত সমিতি, চট্টগ্রাম।

গ্রন্থনা: মোহাম্মদ খছরুজ্জামান



আন্দালিব ভাই সমীপে...

প্রিয় আন্দালিব ভাই!

মাসের প্রথমেই পরওয়ানা হাতে পেয়ে কত যে ভালো লেগেছে তোমাকে ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না। আবাবীল ফৌজের লেখাগুলো খুবই চমৎকার হয়েছে। আশা করি প্রত্যেক সংখ্যায় এরকম মজাদার লেখা উপহার দিবেন।

সামিউল আলম সজীব
লায়ন্স স্কুল এণ্ড কলেজ, রংপুর

-আন্দালিব ভাই

তোমার ভালো লাগাটা আমাদের কাজকে আরো বেগবান করবে। আবাবীল ফৌজ কিন্তু তোমাদেরই বিভাগ। তোমরাও লিখতে পারবে আবাবীল ফৌজে।

সদস্য কুপন

প্রিয় আন্দালিব ভাই, আমি 'আবাবীল ফৌজ' এর সদস্য হতে চাই। আমার বয়স ১৬ বছরের বেশি নয়। আমি ফৌজের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে নিজেকে সচেষ্ট রাখবো।

নাম: ----------

পিতা/অভিভাবক: ----------

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: ---------- শ্রেণি: ----------

গ্রাম: ---------- ডাক: ----------

থানা: ---------- জেলা: ----------

কুপনটি পূরণ করে ডাকযোগে নিচের ঠিকানায় অথবা ছবি তুলে ই-মেইলে পাঠিয়ে দাও।

আন্দালিব ভাই
পরিচালক, আবাবীল ফৌজ
মাসিক পরওয়ানা
বি.এন টাওয়ার, ২৮/১ বি, দৈনিক বাংলা মোড়, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
সিলেট অফিস: পরওয়ানা ভবন ৭৪, শাহজালাল লতিফিয়া আ/এ, সোবহানীঘাট সিলেট-৩১০০
Mobile: 01799 629090, E-mail: parwanaafbd@gmail.com

প্রিয় আন্দালিব ভাই!

আমি নবম শ্রেণিতে পড়ি। পরওয়ানার সাথে আমার নতুন পরিচয় হলো। সংখ্যাটি অসাধারণ হয়েছে। আবাবীল ফৌজের লেখাগুলো খুবই চমৎকার লেগেছে। গল্প, কবিতা, শব্দকল্প ও বর্ণকল্প সব মিলিয়ে অসাধারণ। তোমাকে অনেক ধন্যবাদ এরকম সুন্দর জিনিস উপহার দেওয়ার জন্য।

সালমান আহমদ
হাজী মুহাম্মদ মহসিন কলেজ, চট্টগ্রাম

-আন্দালিব ভাই

তোমাকে পরওয়ানা পরিবারে স্বাগতম। তোমাদের অংশগ্রহণ নিয়মিত হলে অবশ্যই এরকম নিত্যনতুন বিষয় নিয়ে প্রতিমাসে হাজির হবো তোমাদের কাছে। চিঠির জন্য তোমাকে ধন্যবাদ।

প্রিয় আন্দালিব ভাই!

হাসতে জানি বিভাগ পড়ে খুব ভালো লাগলো। সুন্দর আয়োজনের জন্য আন্দালিব ভাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। হাসতে জানি পড়ে সত্যিই হেসেছি এবং খুব মজা পেয়েছি।

সাবিহা সুলতানা
বনশ্রী, রামপুরা, ঢাকা

-আন্দালিব ভাই

তুমি হাসতে পেরেছ শোনে আমিও একটু হেসে নিলাম। তোমাদের দাবিদাওয়া পূরণে আন্দালিব ভাই সর্বদা প্রস্তুত। আরও বিশেষ কোনো পরামর্শ লিখে পাঠাতে পারো আন্দালিব ভাই সমীপে।

প্রিয় আন্দালিব ভাই!

পরওয়ানার নভেম্বর সংখ্যায় আবাবীল ফৌজের গল্পগুলো পড়ে বেশ আনন্দ পেয়েছি। 'আসহাবে উখদুদ', 'এক কথায় এত কিছু' ভীষণ ভালো লেগেছে। উট গল্পটিও চমৎকার ছিল।

জিয়াদ হোসাইন
করতোয়া মাল্টিমিডিয়া স্কুল এণ্ড কলেজ, বগুড়া

-আন্দালিব ভাই

অসংখ্য ধন্যবাদ প্রিয় জিয়াদ হোসাইন। আবাবীল ফৌজের লেখাগুলো তোমার ভালো লেগেছে শুনে খুশি হলাম। তুমিও চাইলে এরকম মজার মজার গল্প লিখে পাঠাতে পারো।

প্রিয় আন্দালিব ভাই!

নভেম্বর মাসের পরওয়ানা পেয়ে আমি খুবই আনন্দিত। পরওয়ানা থেকে অনেক কিছু শেখার পাশাপাশি আবাবীল ফৌজ এ অংশগ্রহণ করতে পারছি। তার জন্য আল্লাহ তাআলার দরবারে শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। পরওয়ানার বহুল প্রচার ও উন্নতি কামনা করছি।

রাহাত আহমদ
শাহজালাল জামেয়া ইসলামিয়া স্কুল এণ্ড কলেজ, মিরাবাজার, সিলেট

-আন্দালিব ভাই

পরওয়ানার আবাবীল ফৌজের নিয়মিত অংশগ্রহণকারী হিসেবে তোমাকে ধন্যবাদ। তোমাদের অংশগ্রহণে আবাবীল ফৌজ সরব থাকবে সেই প্রত্যাশা করছি।

আন্দালিব ভাইয়ের চিঠি

প্রিয় আন্দালিব বন্ধুরা!

আশা করি সবাই ভালো আছো। আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি। আমি জানি তোমাদের খুব ব্যস্ত সময় যাচ্ছে। তোমাদের এই ব্যস্ত সময়ে আমি চলে এলাম হালকা ব্যস্ততা বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য। কী? শুনে মন খারাপ করলে?

না, তোমাদেরকে এখন কোনোভাবেই বিরকত্ করা উচিত নয়। কারণ তোমাদের বার্ষিক পরীক্ষা চলছে। সেই হিসেবে তোমাদের ব্যস্ত টাইম। অনেকে তো পরীক্ষার ব্যস্ততায় খেলাধুলা একেবারে বন্ধ করে দিয়েছে।

হুম, তাতো করতেই হবে। কারণ পুরো এক বছরের কামাই। পুরো বছরের পড়াশোনা খতিয়ান এই বার্ষিক পরীক্ষা।

তোমাদের জন্য অনেক অনেক দুআ যেন সবাই ভালো ফলাফল করতে পারো। তবে হ্যাঁ, পরীক্ষা চলাকালীন হয়তো আমি তোমাদেরকে বিরক্ত করতে আসব না কিন্তু পরীক্ষার পর অবশ্যই তোমার পরীক্ষা কেমন হলো তা জানাতে ভুলবে না। এবং পরীক্ষা পরবর্তী ছুটি কে কীভাবে কাটাচ্ছো তা কিন্তু লিখে জানাবে।

পরীক্ষার প্রস্তুতি খুব ভালোভাবে নিবে। পাশাপাশি নামায আদায় করে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইবে। খাওয়া-দাওয়া যেন রুটিন মাফিক হয় সেদিকে খেয়াল রাখবে। নাহলে শরীর খারাপ করতে পারে।

বিজয়ের মাস ডিসেম্বর। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর আমরা একটি স্বাধীন ভূখণ্ড পেয়েছিলাম। বিজয়ের পতাকায় উড়েছিল লাল সবুজের আবহে। সকলকে মহান বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা।

পরিশেষে তোমাদের পরীক্ষা ভালো ফল পাবো। যে ফল খাওয়া নয় জীবন গঠনে ভূমিকা রাখবে। সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে এই প্রত্যাশা।

ইতি

তোমাদেরই আন্দালিব ভাই

বলতো দেখি?

এ সংখ্যার প্রশ্ন

১. কত হিজরীতে হযরত উসমান ইবন আফফান (রা.) শাহাদাতবরণ করেন?
২. দালাইলুন নুবুওয়াত গ্রন্থের রচয়িতা কে?
৩. কত তারিখ মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন ২০২৪ অনুষ্ঠিত হয়?
৪. রিসালায়ে নূর তাফসীর গ্রন্থের রচয়িতা কে?
৫. তুর্কীর রূহানী প্রাণপুরুষ মাহমুদ এফেন্দী (র.) কত সালে ইন্তিকাল করেন?

গত সংখ্যার উত্তর

১. ১৫০ হিজরীতে
২. ৪০ হিজরীতে
৩. ৭৭.৭৮%
৪. ইবন কাসীর
৫. বোরকা খান

যাদের উত্তর সঠিক হয়েছে [প্রথম তিনজন পুরস্কৃত]

আদিল আহমদ খান, হযরত শাহজালাল (র.) লাতিফিয়া মাদারাসা, গোলাপগঞ্জ, সিলেট # আব্দুস সামাদ, বাদে ভূকশিমইল, ভূকশিমইল, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন, গাজীপুর, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # সাদিয়া জান্নাত, গৌড়করণ, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # মোছাঃ শাহরুন নাহার জুই,হাটুভাঙ্গা আলিম মাদরাসা, সারকারখানা, ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট # কাজী মোঃ জাকির হোসেন, সদরঘাট (কাজী বাড়ি), নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ # মোঃ আজিজুর রহমান, ব্রাহ্মণবাজার, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # কামরুন নাহার ঝুমি, হাটুভাঙা আলিম মাদরাসা, ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট # মেহেদী হাসান ইমন, হযরত শাহখাকী (র.) ইসলামিয়া আলিম মাদরাসা, জুড়ী,মৌলভীবাজার # জামিয়া আক্তার, দিনারপুর ফুলতলী গাউছিয়া সুন্নিয়া দাখিল মাদরাসা, নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ # তানজিনা রহমান ইমরা, হলিয়ারপাড়া সুন্নিয়া হাফিজিয়া মাদরাসা, জগন্নাথপুর, সুনামগঞ্জ # জান্নাতুল ফেরদৌস মরিয়ম, হযরত শাহজালাল দারুচ্ছুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল মাদরাসা, সোবহানীঘাট, সিলেট # তাসলিমা আক্তার, আল আমিন নার্সিং কলেজ, শাহজালাল উপশহর, সিলেট # আহসানা জান্নাত, বাদেদেওরাইল ফুলতলী কামিল মাদরাসা, জকিগঞ্জ, সিলেট # জাসলিমা আক্তার, হযরত শাহজালাল দারুচ্ছুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল মাদরাসা, সোবহানীঘাট, সিলেট # নূর আহমদ রাহাত, হযরত শাহজালাল দারুচ্ছুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল মাদরাসা, সোবহানীঘাট, সিলেট # কাজী মোঃ জাকির হোসেন, সদরঘাট (কাজী বাড়ি), নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ # রাইহান আহমদ রাফি, রাঘবপুর, মোগলাবাজার, দক্ষিণ সুরমা, সিলেট।

শব্দকল্প

১		২	■	৩		৪
	■		■		■	
৫			■	৬		
■	■	■	■	■	■	■
৭		৮	■	৯		১০
	■		■		■	
১১			■	১২		

সূত্র : পাশাপাশি

১। বিচ্ছেদ, পৃথক ৩। একটি আরবী মাসের নাম ৫। রক্তাক্ত ইতিহাসে অর্জিত একটি ভাষা ৬। বিয়েতে স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে প্রদেয় সম্পদ ৭। আদি পিতা ৯। ভারতের একটি রাজ্য ১১। দয়া এর আরবী প্রতিশব্দ ১২। দরিদ্র এর আরবী প্রতিশব্দ।

সূত্র : উপর-নীচ

১। গুনাহ থেকে ফিরে আসা ২। ভিটামিন 'সি' যুক্ত একটি ফল ৩। আল্লাহর একটি গুণবাচক নাম ৪। ইসলামের প্রথম যুদ্ধ ৭। ভক্ষণ করা, খাওয়া ৮। ব্যথানাশক ঔষধ ৯। আরবী একটি হরফ ১০। লাল রঙের ডালবিশেষ।

গত সংখ্যার সমাধান

বু	খা	রী	শ	রী	ফ
■	য়	■	রী	■	দী
জ	বা	■	আ	■	ল
হ	র	■	ত	খ	ত
র	■	ন	■	চি	■
ত	স	বী	■	ত	নু

গত সংখ্যার শব্দকল্পের পরিকল্পনাকারী

মো. নাছির উদ্দিন তালহা

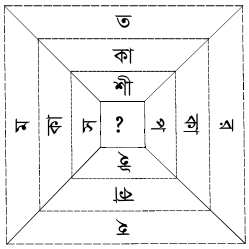
হযরত শাহজালাল দারুচ্ছুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল মাদরাসা, সোবহানীঘাট, সিলেট

শব্দকল্পে যাদের উত্তর সঠিক হয়েছে (প্রথম তিনজন পুরস্কৃত)

সাদিয়া জান্নাত, গৌড়করণ, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # মোঃ আব্দুস সামাদ, নওয়াবাজার আহমাদিয়া ফাযিল মাদরাসা, জুড়ী, মৌলভীবাজার # মো: আনুর আলী, সভাপতি, টিলাগাও ইউনিয়ন তালামীয, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # আব্দুল্লাহ আল হোসাইন, জালালপুর, মোগলাবাজার, সিলেট # রুহুল ইসলাম তুন্না, অর্থ সম্পাদক, বাংলাদেশ আনজুমানে তালামীযে ইসলামিয়া, জালালপুর ইউনিয়ন শাখা, দক্ষিণ সুরমা, সিলেট # সাদিয়া জান্নাত, গৌড়করণ, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # রাশেদ আহমদ, হাসিমপুর আহমদিয়া দাখিল মাদরাসা, কাদিপুর, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # মেহেদী হাসান ইমন, হযরত শাহখাকী (র.) ইসলামিয়া আলিম মাদরাসা, জুড়ী, মৌলভীবাজার # মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন, গাজীপুর, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # জামিয়া আক্তার, দিনারপুর ফুলতলী গাউছিয়া সুন্নিয়া দাখিল মাদরাসা, নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ # কাজী মোঃ জাকির হোসেন, সদরঘাট (কাজী বাড়ি), নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ # মুহাইমিন চৌধুরী তালহা, ক্যাপ্টেন একাডেমি, শাহজালাল উপশহর, সিলেট # আহসানা জান্নাত, বাদেদেওরাইল ফুলতলী কামিল মাদরাসা, জকিগঞ্জ, সিলেট # রাইহান আহমদ রাফি, রাঘবপুর, মোগলাবাজার, দক্ষিণ সুরমা, সিলেট # হাফিজুর রহমান, মৌলভীবাজার টাউন কামিল মাদরাসা, মৌলভীবাজার # মোঃ নাজমুল ইসলাম, সভাপতি তালামীযে ইসলামিয়া, শ্রীমঙ্গল পৌর শাখা, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার # মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন, আউশকান্দি ইয়াকুবিয়া হাফিজিয়া দাখিল মাদরাসা, নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ।

বর্ণকল্প

এ সংখ্যার বর্ণকল্প



বর্ণগুলো এলোমেলো আছে। এগুলো সাজিয়ে কেন্দ্রের ফাঁকা ঘরে একটি মাত্র বর্ণ বসালে চারটি অর্থবোধক শব্দ তৈরি হবে। চেষ্টা করে দেখতো অর্থসহ শব্দ চারটি তৈরি করতে পারো কি না! সঠিক উত্তরদাতাদের নাম আগামী সংখ্যায় ছাপা হবে।

গত সংখ্যার বর্ণকল্পের সমাধান

4	3	1	2
1	2	4	3
3	4	2	1
2	1	3	4

গত সংখ্যার বর্ণকল্পের পরিকল্পনাকারী

আজিম উদ্দিন মাছুম

হযরত শাহজালাল দারুচ্ছুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল মাদরাসা, সোবহানীঘাট, সিলেট

যাদের উত্তর সঠিক হয়েছে

এম, সাহাব উদ্দিন, জায়ফরনগর, জুড়ী, মৌলভীবাজার # সাদিয়া জান্নাত, গৌড়করণ, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # মেহেদী হাসান ইমন, হযরত শাহখাকী (র.) ইসলামিয়া আলিম মাদরাসা, জুড়ী, মৌলভীবাজার # মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন, গাজীপুর, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # আহসানা জান্নাত, বাদেদেওরাইল ফুলতলী কামিল মাদরাসা, জকিগঞ্জ, সিলেট # জামিয়া আক্তার, দিনারপুর ফুলতলী গাউছিয়া সুন্নিয়া দাখিল মাদরাসা, নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ # কাজী মোঃ জাকির হোসেন, সদরঘাট (কাজী বাড়ি), নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ # রাইহান আহমদ রাফি, রাঘবপুর, মোগলাবাজার, দক্ষিণ সুরমা, সিলেট # রাশেদ আহমদ, হাসিমপুর আহমদিয়া দাখিল মাদরাসা, কাদিপুর, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # আবু সাঈদ মাইন, ফরিদপুর, কাদিপুর, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # জান্নাতুল ফেরদৌস মরিয়ম, হযরত শাহজালাল দারুচ্ছুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল মাদরাসা, সোবহানীঘাট, সিলেট # হাফিজুর রহমান, মৌলভীবাজার টাউন কামিল মাদরাসা, মৌলভীবাজার # মোঃ নাজমুল ইসলাম, সভাপতি তালামীযে ইসলামিয়া, শ্রীমঙ্গল পৌর শাখা, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার # মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন, আউশকান্দি ইয়াকুবিয়া হাফিজিয়া দাখিল মাদরাসা, নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ # মোঃ লালন আহমদ রাজু, সহ সাধারণ সম্পাদক, দোয়ারা পূর্ব উপজেলা তালামীয,সুনামগঞ্জ # কামরুন নাহার ঝুমি, হাটুভাঙা আলিম মাদরাসা, ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট # মাহবুবা জান্নাত সামিয়া, ছকাপন উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, কাদিপুর, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # রেদওয়ান আহমদ রমজান, গোটারগ্রাম ইয়াকুবিয়া দাখিল মাদরাসা, বালাউট, জকিগঞ্জ, সিলেট # আবু সালেহ রিয়াদ, হযরত শাহজালাল দারুচ্ছুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল মাদরাসা, সোবহানীঘাট, সিলেট # মুহাইমিন চৌধুরী তালহা, ক্যাপ্টেন একাডেমি, শাহজালাল উপশহর, সিলেট।

অদ্ভুত পৃথিবী

মারফা লাইট



রহস্যময় আলোর খেলা ঘটে চলেছে টেক্সাসের মারফা নামের একটি জায়গায়। সেই আলোকে "ভৌতিক আলো হিসেবে" আখ্যায়িত করা হয়। কারণ, এই জায়গার উপরে ৬ ধরনের আলোর দল আকাশের উপরে ঘুরাঘুরি করছে। অনেকটা ভৌতিক ব্যাপার। ১৮৮৩ সালে প্রথম এ আলোর নৃত্য দেখতে পায় পাশের অঞ্চলে কাজ করা কিছু মানুষের চোখ। স্থানীয় আমেরিকানরা এ আলোকে ধারণা করছে, মহাকাশ থেকে যে তারকা পতিত হয়, সেসব তারকার কারণেই এ ধরনের আলো দল বেধেঁ আকাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু এর পরে আর যেসব ঘটনা ঘটেছে, তার আর কোনো ব্যাখ্যা নেই তাদের কাছে।

আধুনিক যুগে মারফা লাইট (Marfa Light) এর উপস্থিতি সম্পর্কে রিপোর্ট করতে থাকে। আলো গুলোর সাইজ প্রথমে বাস্কেটবলের মতো থাকে। তারপর বিভিন্ন আকার গঠন করতে থাকে। এ পর্যন্ত ৬ টি আলোর দল প্রতিনিয়ত আকাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে ঐ জায়গাকে কেন্দ্র করে। সাদা, লাল, নীল, হলুদ, কমলা এবং সবুজ কালারের আলোর দল। তবে এ আলো কোনো ধরনের বিপদ বা বিরুপ প্রভাব সৃষ্টি করতে দেখা যায়নি এখনো। এয়ারফোর্স, আবহাওয়াবিদ,পদার্থবিদ ও গবেষকেরা এ "মারফা লাইট" সম্পর্কে বিভিন্ন ধরণের ব্যাখ্যা দিয়েছে কিন্তু কেউ কারো সাথে একমত নয় । অনেকে ব্যাখ্যা দিয়েছে এ ধরণের আলো স্পেসশিপগুলোর কারণে ঘটতে পারে। তবে বিজ্ঞানীরা আশাবাদী এই আলোর রহস্য খুব তাড়াতাড়ি বের করতে সক্ষম হবে তারা। আরো বলেছে পৃথিবীর রহস্যময় কিছু ঘটনা ও রহস্যময় জায়গা নিয়েও তারা গবেষণা চালাচ্ছে।

হাসতে জানি

আমার কিছু না বলার নেই!

নাসিরুদ্দীন হোজ্জার বাড়িতে তার এক বন্ধু এসেছেন বেড়াতে। সন্ধ্যায় প্রতিবেশীদের সাথে পরিচয় করাতে নিয়ে যাওয়ার সময় হোজ্জা নিজের একটি ভাল পোশাক ধার দিলেন। প্রথম বাড়িতে বন্ধুকে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার সময় এও জানালেন, এর গায়ে যে পোশাকটি দেখছেন, তা আসলে আমার।

সেখান থেকে বেরিয়ে বন্ধু মহা ক্ষ্যাপা। কী দরকার ছিল ওটা বলে আমাকে অপমান করার? হোজ্জা বন্ধুর কাছে ক্ষমা চাইলেন।

দ্বিতীয় বাড়িতে গিয়ে বললেন, এর গায়ে যে পোশাকটি দেখছেন, তা আসলে এরই। এবার তো বন্ধু আরো ক্ষ্যাপলেন। পোশাকটি নিয়ে তুমি কিছু না বলাই ভাল।

তৃতীয় বাড়িতে গিয়ে তাই হোজ্জা বললেন,ইনি আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু আর এর গায়ে যে পোশাকটি দেখছেন, সে সম্পর্কে আমার কিছু না বলার নেই!

গ্রন্থণা: ফয়সল আহমদ (প্রভাষক), স্কলার্সহোম মেজরটিলা কলেজ, ইসলামপুর, সিলেট

আবাবিল ফৌজের সদস্য হলো যারা

৩৪৯২. মো. আহমদ আলী
পিতা: মো. আব্দুল হান্নান
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: ভাটেরা সাইফুল তাহমিনা আলিম মাদরাসা
গ্রাম: ইসলামনগর
ডাক: ভাটেরাবাজার
থানা: কুলাউড়া
জেলা: মৌলভীবাজার

৩৪৯৩. মোছা. জান্নাতুল ফিরদাউস
পিতা: মো. হাবীব উল্লাহ
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: মাথিউরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
গ্রাম: মাথিউরা (পূর্বপাড়া)
ডাক: মাথিউরা বাজার
থানা: বিয়ানীবাজার
জেলা: সিলেট

৩৪৯৪. মোছা. ফাওযিয়া ফিরদাউস
পিতা: মো. হাবীব উল্লাহ
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: মাথিউরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
গ্রাম: মাথিউরা (পূর্বপাড়া)
ডাক: মাথিউরা বাজার
থানা: বিয়ানীবাজার
জেলা: সিলেট

৩৪৯৫. মুনাইম আহমদ সাকিন
পিতা: আমিন আলী
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: সপ্তগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয়
গ্রাম: উত্তর সাদিপুর
ডাক: গৌরীশংকর
থানা: কুলাউড়া
জেলা: মৌলভীবাজার

৩৪৯৬. আশরাফুর রহমান নাইম
পিতা: মাও. আজাদুর রহমান
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: হযরত শাহজালাল লতিফিয়া আইডিয়াল মাদরাসা
গ্রাম: লামুয়া
ডাক: লামুয়া বাজার
থানা: মৌলভীবাজার
জেলা: মৌলভীবাজার

৩৪৯৭. মো. মেহেদী মাহবুব
পিতা: সুহেল আহমদ
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: মাদরাসায়ে দারুস সুন্নাহ সিলেট
গ্রাম: রায়গড়
ডাক: রায়গড় বাজার
থানা: গোলাপগঞ্জ
জেলা: সিলেট

৩৪৯৮. নাজিবা রহমান তাহমিনা
পিতা: আবু সালেহ মো. লুৎফুর রহমান
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: মাদরাসায়ে দারুস সুন্নাহ সিলেট
গ্রাম: বড়দল
ডাক: নতুনবাজার
থানা: ছাতক
জেলা: সুনামগঞ্জ

৩৪৯৯. ফাওযিয়া তালুকদার
পিতা: নূর মোহাম্মদ তালুকদার
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: মাদরাসায়ে দারুস সুন্নাহ সিলেট
গ্রাম: নোয়াগাঁও
ডাক: ভূরকীবাজার
থানা: বিশ্বনাথ
জেলা: সিলেট

৩৫০০. নূরুন নাযিল তালুকদার
পিতা: নূর মোহাম্মদ তালুকদার
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: মাদরাসায়ে দারুস সুন্নাহ সিলেট
গ্রাম: নোয়াগাঁও
ডাক: ভূরকীবাজার
থানা: বিশ্বনাথ
জেলা: সিলেট

৩৫০১. হুসাইন আহমদ
পিতা: ড. একেএম সালাহউদ্দীন
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: সৃজনী বিদ্যানিকেতন
গ্রাম: ৪/এ, রব্বানী ভিলা
ডাক: দুমকি
থানা: দুমকি
জেলা: পটুয়াখালী

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

২০২৪ ইংরেজি সালের ডিসেম্বর সংখ্যা প্রকাশ করার মাধ্যমে বাংলা জাতীয় মাসিক পরওয়ানা সফলতার সাথে আরও একটি বছর অতিবাহিত করলো। এজন্য মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি– আলহামদুলিল্লাহ। ১৯৯২ সাল থেকে প্রকাশ হওয়া মাসিক পরওয়ানা পাঠকমহলে শুরু থেকেই জনপ্রিয়তা পায়। সঙ্গত কারণে বিগত দশকে পরওয়ানা কিছুটা অনিয়মিত হয়ে পড়ে। দীর্ঘ বিরতির পর ২০২১ সাল থেকে পরওয়ানা দ্বিতীয় ধাপে নবোদ্যমে যাত্রা শুরু করে। লেখক, পাঠক, বিজ্ঞাপনদাতা, পৃষ্ঠপোষক, শুভাকাঙ্ক্ষীসহ সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় মাসিক পরওয়ানা এগিয়ে চলছে নিজস্ব গতিতে। বিশেষ করে প্রিন্ট প্রকাশনার ক্রান্তিলগ্নে শামসুল উলামা আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.)-এর প্রবাসী কতেক মুরিদীন, মুহিব্বীনের আর্থিক সহযোগিতা পত্রিকার স্বাভাবিক যাত্রা চলমান রাখতে সম্ভবপর করেছে। তাদের প্রতি পরওয়ানা পরিবার **আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ**। আশা করছি পরওয়ানার জন্য আপনাদের অবদান ও নিরঙ্কুশ ভালোবাসা পরবর্তী দিনগুলোতেও অব্যাহত থাকবে। প্রিন্টের পাশাপাশি ওয়েবসাইটেও পরওয়ানার কিছু লেখা প্রকাশ করা হয়। অতি শীঘ্রই মাসিক পরওয়ানার অ্যাপ ভার্সন পাওয়া যাবে। যাতে পৃথিবীর যে কোনো প্রান্ত থেকে পত্রিকা পড়া যাবে স্মার্টফোন কিংবা ট্যাবলেট-কম্পিউটারে। নিয়মিত পরওয়ানা পড়ুন। অন্যজনকে পড়তে উৎসাহিত করুন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আপনাদের সবার জীবন নিরাপদ, সুন্দর ও সুখময় করতঃ সুস্থতার সাথে দীর্ঘায়ু দান করুন। আমীন।

Al ISLAH
CASH & CARRY



CASH & CARRY AND WHOLESALE
OPEN TO THE PUBLIC
CATERERS ONESTOP SHOP
LARGE PARKING

WE SPECIALIZE IN FULL CATERING SUPPLIES
WE SPECIALIZE FOR YOUR FULL PACKAGING SUPPLIES
RICE, FLOUR, SPICES, TIN PRODUCT, PAULTRY, LAMB, MUTTON

290-294, BISCOT ROAD
LUTON, LU3 1AZ

01582 414154
07769 778127